সম্পাদকের কলমে

প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৪

প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬৪

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক : অরিজিৎ কুমার। প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন। কলিকাতা ৪

মুদ্রক : শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়। বি. এম. এণ্টারপ্রাইজ
২২/বি বেথুন রো। কলিকাতা ৬

লিটল ম্যাগাজিনের জেদি সম্পাদকদের উদ্দেশ্যে

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণেই যে-বইয়ের বিলয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, তাকে পুনরুদ্ধার করলেন প্যাপিরাস-এর কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে কিছু-কিছু নবীন পত্রিকার সম্পাদক আমার কাছে এই বইটির খোঁজ করেছেন, তাতে মনে হয়, এই রচনাগুলির হয়তো কিছুটা প্রয়োজনীয়তা আছে।

সম্পাদকের কলমে

বাংলা ভাষার একটি ভালো মাসিক পত্রিকা অনেকদিন থেকেই নেই। বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, বিচিত্রা, কল্লোল, ভারতবর্ষ, বসুমতী ইত্যাদি পত্রিকার যে একটি ঐতিহ্য তৈরি হয়েছিল, হঠাৎ সেখানে একটা শূন্যতা এসে গেল কি করে কে জানে!

সেই রকম একটি পত্রিকার অভাব বোধ করছিলাম বেশ কিছুদিন ধরেই। বিভিন্ন বন্ধুমহলে একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছিল। তাবপর সবাই মিলে একটি মাসিক পত্রিকা বার করতে দৃঢ়সংকল্প হই মাত্র তিন মাস আগে। সেই উপলক্ষে ২৫ জুন—আমার বাড়িতে সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় একটা মিটিং ডাকা হলো।

সেই দিনই লোড শেডিং। শুধু অন্ধকার নয়, জুন মাসের গরমে ঘরের মধ্যে বসে এরকম একটি গুরুতর বিষয়ে মিটিং করা চলে না। আমরা উঠে গেলাম ছাদে, সতরঞ্চি পেতে বসে অন্ধকারে আমাদের সভা শুরু হলো। সেখানে উপস্থিত শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমাব মুখোপাধ্যায়, সমবেন্দ্র সেনগুপ্ত, তারাপদ রায়, পার্থসারথি চৌধুরী, শীতল চৌধুরী, গণেশ দে এবং আমি। গণেশ দে মহাশয় উপস্থিত ছিলেন প্রেসের পক্ষ থেকে। বস্তুত, শ্রীযুক্ত গণেশ দে'র বিশেষ উৎসাহই আমাদের সমবেত করে সেদিন। তিনিও একটি খাঁটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের কথা ভাবছিলেন। তাঁর পরিকল্পনার সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনা মিলে যায়। এছাড়া আরও কয়েকজন উৎসাহী বন্ধুকে খবর দেওয়া যায়নি। প্রচুর চ্যাঁচামেচি, আবেগ, সিগারেট, উদ্দীপনা ও সামান্য কিছু পানীয় সহযোগে আলোচনা চলে প্রায় তিন ঘণ্টা। সকলেই একমত হন যে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হবেই। এতে কি ধরনের রচনা থাকবে, পত্রিকার উদ্দেশ্য কি হবে—এবং পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কেও একটি খসড়া তৈরি হয়।

এইভাবে দক্ষিণ কলকাতার একটি বাড়ির ছাদে, অন্ধকারে এই পত্রিকার জন্ম হলো। নামকরণ সম্পর্কে চিন্তা করতে হয়নি একবারও। কৃত্তিবাস তো আছেই।

এখানে কৃত্তিবাসের পূর্ব পরিচয় সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। আমাদের ছাত্রাবস্থায় দীপক মজুমদার (এখন গ্রীসে প্রবাসী) ছিল একটি দুর্দান্ত চরিত্র। সে স্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় একবার জেল খাটে। কলেজে ঢুকেই দ্বিতীয়বার। এ পর্যন্ত সর্বসমেত তার পা ভেঙেছে সতেরোবার—এতবার একজন মানুষের পা ভাঙার নজির বোধহয় পৃথিবীতে আর নেই। দীপক স্কুল থেকেই আমার সহপাঠী এবং প্রতিবেশী। সে খুব অল্পবয়স থেকেই কবিতা ও প্রবন্ধ লেখে। সুকান্ত ভট্টাচার্য তার বন্ধু এবং বিখ্যাত লেখকেরা সকলেই তাকে চেনে। তখন আমি লেখার কথা চিন্তাও করি না। কলেজে এসে, 'দেশ' পত্রিকায় আমার প্রথম কবিতাটি ছাপা হবার পর দীপক আমাকে সামান্য একটু গুরুত্ব দেয়।

যাই হোক, বন্ধুর আদেশেই আমি আরও কয়েকটি কবিতা রচনা করি। কোলরিজ এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রথম যৌবনে যুগ্মভাবে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন বলেই দীপক জেদ ধরে যে তার এবং আমার কবিতা নিয়ে একটি কবিতার বই বার করা দরকার। মলাট আঁকার গৌরব সে সত্যজিৎ রায়কে দিতে চায় এবং প্রকাশক হিসেবে নির্বাচন করে সেই সময়কার সবচেয়ে খ্যাতিমান প্রকাশক সিগনেট প্রেসকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই, সিগনেট প্রেসের পরিচালক শ্রীদিলীপকুমার গুপ্ত আমাদের মতো দুটি হঠকারী সদ্য-যুবাকে তদ্দণ্ডেই রূঢ় বা মিষ্টবাক্য বলে বিদায় করেননি।

সবকিছু শোনার পর শ্রীদিলীপকুমার গুপ্ত আমাদের একটি অত্যন্ত সময়োপচিত পরামর্শ দেন। তিনি বললেন, শুধুমাত্র দু'জনের কবিতার বদলে, আরও অনেকের কবিতা নিয়ে একসঙ্গে একটা কিছু বার করুন না। অর্থাৎ একটি কবিতার পত্রিকা। আমরা তৎক্ষণাৎ রাজি। অনেক আলোচনার পর নাম ঠিক হয় কৃত্তিবাস। নামটি শ্রীদিলীপকুমার গুপ্তেরই মনে এসেছিল। প্রথম সংখ্যার কাগজ (আহা, কি ভালো কাগজ !) তিনিই দিয়েছিলেন একটি মাত্র বিজ্ঞাপনের পরিবর্তে। মলাটটিও ছাপিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, একবার পছন্দ না হওয়ায় দু'বার। নতুন উদ্যোগপর্বে আমি এইসব পুরোনো ঋণ স্বীকার করে যেতে চাই।

প্রথম দিকে সম্পাদক হিসেবে নাম ছিল তিনজনের। আমাদের অন্য এক বন্ধু, আনন্দ বাগচী তখন কবি হিসেবে রীতিমতন খ্যাতিমান। আনন্দ বাগচী অবশ্য কৃত্তিবাসের জন্য খুব একটা পরিশ্রম করেননি সেই সময়।

দীপক অত্যন্ত অস্থির স্বভাবের। কোনো একটি কাজে কিংবা এক বাড়িতে,

এমনকি এক দেশে বেশিদিন আটকে থাকা তার ধাতে সয় না। প্রথম তিনটি সংখ্যা প্রকাশের পর দীপক কৃত্তিবাসের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেয়। এরপর থেকে পরিচালনা ও সম্পাদনার সব ভার একা আমার ওপর বর্তায়। এখানে একথা স্বীকার করতেই হবে যে প্রথম তিনটি সংখ্যাতেই কৃত্তিবাস অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল এবং এর অধিকাংশ কৃতিত্বই দীপকের। আমি ভার নেবার পর আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, ফণিভূষণ আচার্য, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, সমীর রায়চৌধুরী, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, তারাপদ রায় এবং আমার কয়েকজন অলেখক বন্ধু, আশুতোষ ঘোষ, উৎপলকুমার রায়চৌধুরী এবং ভাস্কর দত্ত। শক্তি চট্টোপাধ্যায় গদ্য ছেড়ে কবিতার জগতে আসেন কৃত্তিবাসের ষষ্ঠ কি সপ্তম সংখ্যা থেকে। বিলেতফেরৎ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় নিজে কাঁধে করে কৃত্তিবাস স্টলে স্টলে পৌঁছে দিয়েছেন। ফণিভূষণ আচার্য একসময় এই পত্রিকার জন্য সবস্ব পণ করতে চেয়েছিলেন। মূলত গদ্যলেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ও এই সময় থেকে কৃত্তিবাসের দলে ভিড়ে যান।

একটি কবিতার পত্রিকা চালানো সহজ কথা নয়। অর্থাভাব ছিল আমাদের জন্মসঙ্গী। বিজ্ঞাপন পাওয়ার আশায় কত অফিসের বড়ো সাহেবের চেম্বারের বাইরে টুলে বসে থেকেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দাম আদায়ের জন্য এক স্টলে গেছি দশ-এগারো বার। প্রেসের খরচ তোলার জন্য আমাকে একাধিক প্রাইভেট টিউশানি এবং খবরের কাগজে ফিচার লিখতে হয়েছে। একসময় আমি একই সঙ্গে রোজ দুপুর ও রাত্তিরে দুটি চাকরি এবং সকালে ও সন্ধেবেলা দুটি টিউশনি করেছি। আমি গদ্য লিখতে শুরু করি অনেকটা এই কারণে। মনে আছে, এক সংখ্যা কৃত্তিবাসের প্রেসের ধার মেটাবার জন্যই আমাকে একটি সিনেমাপত্রিকায় 'অরণ্যের দিন-রাত্রি' নামে একটি উপন্যাস লিখতে হয়েছিল।

তবু, কৃত্তিবাস হয়ে উঠেছিল আমাদের অনেকের জীবনযাত্রার সঙ্গী। আমাদের আড্ডা, হুল্লোড়, আকস্মিক ভ্রমণ ও বেঁচে থাকারই অঙ্গ হয়ে উঠেছিল কৃত্তিবাস। আমরা নানারকম ভুল করেছি বটে, তবে সবকিছুই হাসি-খুশিতে হয়েছে।

পঁচিশটি সংখ্যা প্রকাশের পর আমার উদ্যম ফুরিয়ে যায়। এর আগেও কয়েকবার আমি কৃত্তিবাসকে নিজের হাতে মেরে ফেলতে চেয়েছি, কিন্তু মায়াবশত পারিনি। আমি মাঝখানে যখন প্রবাসে ছিলাম, তখন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

এটিকে বাঁচিয়ে রাখেন। তিনি সম্পাদনা করেন তিনটি সংখ্যা। পঁচিশ নম্বর সংখ্যার কাজ চলার সময়ে আমার বাঁ জুলফিতে একটি সাদা চুল দেখা গেল। তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিই যে আমার দ্বারা আর লিট্‌ল ম্যাগাজিন-এর সম্পাদনা মানায় না। তরুণতর কারুর ভার নেওয়া উচিত এই পত্রিকার।

আমি ঘোষণা করে ছেড়ে দেবার পর বেলাল চৌধুরী কৃত্তিবাসের দায়িত্ব নেয়। বেলাল চৌধুরী আর এক ছন্নছাড়া ছেলে, পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে ঘুরতে ঘুরতে কি করে যেন কলকাতায় পৌঁছেছিল। এই বিশ্বে চিরকালই কিছু লোক জন্ম-বাউণ্ডুলে হয়, বেলাল তাদেরই একজন। বেলাল যে কয়েকটি সংখ্যা সম্পাদনা করেছে, তাতে তার চরিত্রের চমৎকার ছাপ পড়েছে। কিন্তু যার খাওয়ার ঠিক নেই, নির্দিষ্ট কোনো থাকার জায়গা নেই, তার পক্ষে কোনো পত্রিকা নিয়মিত চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। বেলাল ছেড়ে দেবার পর বেশ কিছুদিন কৃত্তিবাস বন্ধ ছিল। তবু পুরোনো স্নেহে আমরা কৃত্তিবাসের কথা মাঝে মাঝে ভাবতাম। পরবর্তী তরুণরা কেউ কেউ আমাকে আবার কৃত্তিবাস বার করার কথা বলতেন। আমি নিজে আর পারিনি, বন্ধুবান্ধবদের কাছে জনে জনে সাধাসাধি করেছি কৃত্তিবাসের ভার নেবার জন্য।

তখন এগিয়ে আসেন সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। তিনি বিপুল শক্তিতে কৃত্তিবাসকে গুছিয়ে তোলেন। তরুণ ও অতিতরুণদের জন্য তিনি এই পত্রিকার দরজা হাট করে খুলে দেন। তাঁর আমলেই কৃত্তিবাস ঠিক নিয়মিত হয়েছে। সমরেন্দ্র কৃত্তিবাসকে সুষ্ঠু করে তোলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু ইদানীং তাঁকে প্রায়ই অন্য কাজের জন্য কলকাতার বাইরে থাকতে হয় বলে তিনি বেশি সময় দিতে পারছিলেন না। আবার ফিরিয়ে দিতে চাইছিলেন আমাকে! এই সময়েই নতুন মাসিক পত্রিকার চিন্তা।

কৃত্তিবাস কবিতা পত্রিকার মৃত্যু হয়ে গেল। এর চেয়ে দীর্ঘায়ু কোনো লিট্‌ল ম্যাগাজিনের মানায় না। মাসিক কৃত্তিবাস একটি নতুন ও পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যপত্রিকা। এই পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য, শিল্প, সমাজের শ্রীবৃদ্ধি আমাদের কাম্য। দেখা যাক, কতটা কি হয়।

এক হিসেবে সময়টা অতি দুঃসময়। কাগজের বাজার এখন আগুন, ছাপার সব রকমের খরচ অসম্ভব বেড়েছে, পত্র-পত্রিকার জগতে একটা লণ্ডভণ্ড অবস্থা। পত্রিকার প্রধান সহায় বিজ্ঞাপন, সে দিকটাও এখন সঙ্কুচিত। এইজন্যই অনেক শুভার্থী আমাদের এই ঝুঁকি না নিতে পরামর্শ দিচ্ছিলেন। কিন্তু এই সংকটের

সময় আমরা কি একেবারে নীরব হয়ে থাকব? সৎ শিল্প-সাহিত্যকে নিমজ্জিত হতে দেখব? তাছাড়া আমরা মনে করি, দুঃসময়ই কোনো নতুন কাজ শুরু করার প্রকৃষ্ট সময়।

খাদ্য জিনিসটা ভদ্রলোকের আলোচনার বিষয় নয়। পৃথিবীতে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ আছে। খাদ্য যথাসময়ে এসে যাবে, আমরা অন্যান্য চিন্তা ও কাজে ব্যাপৃত থাকব, এরই নাম সভ্যতা। প্রতিদিন খাদ্যের সন্ধানে বেরুতে হবে না এবং ভাণ্ডারে জমিয়ে রাখার যোগ্য খাদ্য, অর্থাৎ শস্যের আবিষ্কারের দিন থেকেই মনুষ্য সভ্যতার জন্ম। সেই সভ্যতা বহুদূর এগিয়ে আসার পর আমরা টের পেয়েছি, পৃথিবীর বহু সংখ্যক মানুষ, সভ্যতারও কোনো স্পর্শ পায়নি, দু'-বেলা খেতেও পায় না। খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার পাশাপাশি গড়ে উঠেছে একটা শোষণ ব্যবস্থা।

মেদিনীপুরের এক গ্রামে, সদ্য চষা ক্ষেতের পাশে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় বসে একজন শিক্ষিত চাষী আমাদের বলেছিলেন, এখান থেকে যেদিকে ইচ্ছে দশ মাইল ঘুরে আসুন, বুঝতে পারবেন রাইটার্স বিল্ডিং, বিশ্ববিদ্যালয়, পুলিশ, ইন্দিরা গান্ধী, মিগ বিমান, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি, পাতাল রেল এসব কোনো কিছুরই মূল্য নেই আমাদের কাছে। এখানকার মানুষ শুধু চিন্তা করে দু'বেলা কি করে পেট ভরাবে। পেট ভরে না অনেকেরই।

কথাটার আপাত যুক্তির সত্যতা বুকে ধাক্কা দেয়। কোন্ সভ্যতা নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি! হাটে-বাজারে, রাস্তায় শুধু জীর্ণ-শীর্ণ মানুষ। ঠিক অনাহারে ক'জন মরছে, সে সংখ্যাতত্ত্বে প্রয়োজন নেই, কিন্তু গ্রামে গ্রামে শুধু রোগা আর দুর্বল মানুষের ভিড়, লঙ্গরখানায় যারা গমের খিচুড়ি খেয়ে এখনো বেঁচে আছে, তারা আরও দু' এক বছর এই ভিক্ষান্ন খেয়ে কোনোক্রমে বেঁচে থাকবে মাত্র। এই ভাবে গড়ে উঠছে দেশজোড়া একটা অক্ষম মানুষের জাত।

আমরা যারা শহুরে ভদ্রলোক, আমরা এখনো দু'বেলা খেতে পাই। রেশন ব্যবস্থা যাই হোক-না কেন, খোলা বাজারে অঢেল চাল, দাম বাড়লেও বাড়িতে

ভাত বন্ধ হয় না। মধ্যবিত্তের সাংসারিক খরচের মধ্যে এখনো শুধু চালের দামটুকু একটা ভগ্নাংশ মাত্র। আমরা এরকম ভেবে রেখেছিলাম যে চাষী যেমন আমাদের জন্য খাদ্য জোগাচ্ছে, তেমনি তার বদলে আমরা তাদের দিচ্ছি বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্র, শিল্প-সাহিত্য, পোশাক ও আইন-শৃঙ্খলা, যেগুলি উৎপাদন করার ক্ষমতা তার নেই, কিন্তু ভোগ করার অধিকার আছে। আসলে ব্যাপারটা তা ঘটে না। চাষীর রক্ত-জল করা ফসল আমাদের রন্ধনশালায় ঠিকই আসে। কিন্তু আমাদের দ্বারা উৎপন্ন কোনো জিনিসই তার কাছে পৌঁছোয় না। বরং তার মুখের গ্রাসও আমরা কেড়ে নিচ্ছি। আমাদের সরকার চাষীর কাছ থেকে জোর করে লেভি আদায় করে টিঁকিয়ে রাখতে চান রেশন ব্যবস্থা, যা শুধু শহরের জন্য। শহরের মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা আছে, এমনকি ভিখিরিরও, সে পায় রেশন থেকে শস্তা দরে অন্তত কিছু চাল গম। আর গ্রামের ভূমিহীন কৃষক বা সাধারণ শ্রমজীবীর বছরে অন্তত চার পাঁচ মাস কোনো কাজই থাকে না। তার ক্রয়-ক্ষমতা সহজেই অনুমেয় —তার জন্য রেশন ব্যবস্থা নেই, সে চার পাঁচ টাকা কিলো দরে চাল কিনতে বাধ্য। সে তখন অনাহারে ধুঁকতে থাকে, এবং তার মৃত্যুর মাত্র কিছুক্ষণ আগে তার জন্য খোলা হয় লঙ্গরখানা, যাতে তার মৃতদেহের ছবি বিদেশি কাগজে ছাপা না হয়। এই এক অদ্ভুত ব্যবস্থা, এর নাম গণতন্ত্র। অবশ্য যে গণতন্ত্রের নির্বাচন ব্যবস্থাটাই পুরোপুরি জুয়োচুরি ও টাকার খেলায় পরিণত হয়েছে, তার কাছ থেকে আর বেশি কী আশা করা যায়!

সম্প্রতি রোমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন, একশো কুড়িটি দেশের প্রতি-নিধি সেখানে উপস্থিত। যে রাষ্ট্রসংঘ একটি বক্তৃতাবাজির আখড়া, তার উদ্যোগে এই প্রথম পৃথিবীতে মোটামুটি সব ক'টি রাষ্ট্র মিলিত হয়েছে খাদ্য নিয়ে আলো-চনার জন্য। যুদ্ধের চেয়ে মানুষের খাদ্য জোটানো যে অনেক জরুরি, তা এতদিন খেয়াল হয়নি। পৃথিবীর জনসংখ্যা এখন যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে সামগ্রিক-ভাবে মনুষ্য জাতির খাদ্য-চিন্তা অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠছে। কিন্তু যেহেতু এই সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা খেতে পাওয়া শ্রেণীর লোক, তাই সংখ্যাতত্ত্ব ও গোষ্ঠীপ্রীতির ব্যাপারটাই প্রধান। তাছাড়া, যে আন্তর্জাতিক খাদ্য ব্যাঙ্কের পরি-কল্পনা করা হয়েছে, তার কর্তৃত্বভার নিয়ে রাজনৈতিক লড়াই-এর চিহ্নও প্রকট। আমরা জানি, এই সম্মেলনের ফলাফল কি হবে! তর্কের মীমাংসা হবে না, আবার আগামী বছর কোনো একটা স্বাস্থ্যকর জায়গায় আর একটি সম্মেলনের তারিখ নির্দিষ্ট হবে। ইতিমধ্যে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়িতে লাখ লাখ

মানুষ আধপেটা খেয়ে ধুঁকতেই থাকবে। ইতিমধ্যে আমরা তৈরি হতে থাকব আর একটা সাধারণ নির্বাচনের জন্য, যাতে খরচ হবে কয়েক শো কোটি টাকা। সেই টাকা যারা সরবরাহ করবে রাজনৈতিক দলগুলিকে—নির্বাচনের পর তারা সুদে-আসলে তুলে নেবে। সেই টাকা তোলার নিশ্চিন্ততম উপায়, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যগুলো মজুত করে দাম বাড়ানো। এই ব্যবস্থা আমরা অনেকেই বুঝে গেছি, কিন্তু কে কি করছি!

কৃত্তিবাসের দ্বিতীয় সংখ্যা ঠিক নির্দিষ্ট তারিখেই প্রকাশিত হলো। পাঠক, গ্রাহক ও লেখকদের কাছ থেকে আমরা যে রকম আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যা আমাদের মনোমত হয়নি, দ্বিতীয় সংখ্যার সামান্য উন্নতি করতে পেরেছি, আশা করি, আর কয়েকটি সংখ্যা পরে পত্রিকাটি একটি নির্দিষ্ট আকার নেবে।

একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ঝক্কি-ঝামেলা অনেক। এ কাজে আমরা অনভিজ্ঞ। সুতরাং নানা ভুল-ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। প্রথম সংখ্যা বেরুবার পর নানা রকম গুজবও ছড়িয়ে পড়েছিল। কেউ বলেছেন, এ কাগজে বিজ্ঞাপন উঠেছে এক লক্ষ টাকার, গ্রাহক হয়েছেন দশ-কুড়ি হাজার। আবার কেউ বলেছেন, ওদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে, দু'-এক মাসের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ইত্যাদি। এসবই হাস্য পরিহাসের কথা। আসলে আমাদের গ্রাহক হয়েছেন কয়েক শো মাত্র, বিজ্ঞাপন মোটামুটি—তবে আমরা পত্রিকা যত কপি ছাপিয়েছিলাম সবই বিক্রি হয়ে গেছে। খুব একটা বড়ো পত্রিকা করার ইচ্ছে আমাদের নেই, ব্যবসা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়—একটি সাহিত্যের মাসিক পত্রিকার অভাব বোধ করেই আমরা এই পত্রিকা প্রকাশে ব্রতী হয়েছি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এই পত্রিকার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন; আরও পাওয়া যাচ্ছে অনেকের সক্রিয় সহযোগিতা, এবং গণেশ দে'র উদ্যম ছাড়া এ-পত্রিকার প্রকাশ সম্ভবই হতো না।

তিনজন টেলিগ্রাম করে পাঠিয়েছেন গ্রাহক চাঁদা—কারণ আমরা একবার বিজ্ঞাপন লিখেছিলাম ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে না পৌঁছোলে শারদীয় সংখ্যা দেওয়া হবে না। সাগরময় ঘোষ একদিন আমাদের কার্যালয় দেখতে এসে পকেট থেকে ফস করে তিরিশ টাকা বার করে বললেন, আমাকে তোমাদের গ্রাহক করে নাও। এছাড়া, অনেক অধ্যাপক, লেখক, ডাক্তার, ছাত্র, আইনজীবী পত্রিকা

বেরুবার আগেই ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এসে গ্রাহক হয়ে গেছেন। এই আগ্রহ ও আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ। ১০ সেপ্টেম্বর পত্রিকার প্রকাশ উপলক্ষে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে একটি উৎসব হয়, সময়াভাবে চিঠি দিয়ে নেমতন্ন করতে পারিনি কাউকেই, কিন্তু কাগজে একটা ছোট বিজ্ঞাপন দিয়েই বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি-সমেত কয়েক হাজার উৎসাহী দর্শক ও শ্রোতা আমরা সেদিন পেয়েছি। এ থেকে বোঝা যায়, একটি মাসিক পত্রিকার অভাব অনেকেই বোধ করেছেন।

পত্রিকা বেরুবার পর বহু গ্রাহক আমাদের চিঠি দিয়ে জানাচ্ছেন যে, তাঁরা পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা পাননি। অধিকাংশ চিঠিই ক্ষোভ ও অভিমানের। আমরা বিমূঢ় বোধ করি। গ্রাহক চাঁদা উল্লেখ করার সময় আমরা, অনভিজ্ঞতার কারণে, রেজিস্ট্রি খরচের কথা উল্লেখ করিনি। পত্রিকা পাঠাতে গিয়ে দেখা গেল, প্রতি কপি রেজিস্ট্রি করতে তিন টাকা খরচ। সুতরাং সকলকে রেজিস্ট্রি করতে গেলে আমাদের দেউলিয়া হতে হয়। পরে সকলকেই আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং-এ পাঠানো হলো। তারও দু-তিন সপ্তাহ পরে অভিযোগের চিঠি, পত্রিকা পৌঁছোয়নি! ইতিমধ্যে আমরা জেনে গেছি, সংবাদপত্রেও লেখালেখি হয়েছে যে, পুজোর ঠিক আগেই ডাক ব্যবস্থার এক বিপুল গোলমাল দেখা দেয়। লক্ষ লক্ষ চিঠি ও প্যাকেট স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে। তার মধ্যে আমাদের পত্রিকার কপি জমে থাকা অস্বাভাবিক নয়। আমাদের বহু ভি.পি-ও পৌঁছোয়নি আমরা জেনেছি। ডাক বিভাগের এই বিশৃঙ্খলার জন্য কর্তৃপক্ষ এবং কর্মী ইউনিয়ন দু'রকম কথা বলেছেন—সে প্রশ্নে না গিয়েও আমরা বলতে পারি, এজন্য বঞ্চিত ও ক্ষতি-গ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ।

দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে আমরা যথাসম্ভব দ্রুত পাঠাবার চেষ্টা করছি। হে পাঠক ও গ্রাহক, আপনি উতলা হতে পারেন বটে কিন্তু নিরাশ হবেন না।

প্রতিবেশী বাংলাদেশ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কখনো কোনো কথা উচ্চারণ করেন না। আপাতদৃষ্টিতে এটাই স্বাভাবিক মনে হয়। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, তার সঙ্গে ভারতের যা-কিছু যোগাযোগ বা বাক্যালাপ, সবই হবে একমাত্র

রাজধানী দিল্লি মারফৎ। এটাই সংবিধানসম্মত নিয়ম।

নিয়মের সৃষ্টি হয় মৌলিক উপকারের জন্য। কিন্তু কখনো নিতান্ত নিয়মতান্ত্রিক হয়ে পড়ার ফলে কোথাও কোনো গভীর ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে কিনা, সেটা বিচার করে দেখতে হবে না?

বাঙালি-জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়েছিল গত শতাব্দী থেকেই। এখন বাঙালিরা দুটি জাতি, দুটি আলাদা দেশের অধিবাসী। এটা একটা স্বীকৃত ঘটনা। তবে, এর পাশাপশি বাঙালি মানসিকতা বলে যে একটা জিনিসও ছিল, সেটা কি এত তাড়াতাড়ি দ্বিখণ্ডিত করা সম্ভব? আমরা ঢাকায় বেড়াতে গেলে যখন কেউ আমাদের বলেন, আপনারা ইণ্ডিয়ার লোক, তখন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়, ক্ষণেকের জন্য কথাটা অচেনা শোনায়। আমরা ভারতের নাগরিক এটা তো ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়ে, আমরা বাঙালি, আমরা তোমাদেরই মতন। এই অনুভূতির মর্ম কি দিল্লি বোঝে? রাশিয়া, আমেরিকা বা জাপানে বেড়াতে গেলে আমরা ভারতীয় হিসেবেই নিজেদের পরিচয় দিই, কিন্তু বাংলাদেশে আমরা বাঙালি। এটা একটা নিয়মবহির্ভূত ঘটনা কিন্তু সত্য। এর বাস্তব স্বীকৃতি না দেওয়া যুক্তিহীন।

সুতরাং সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলাদেশের যে সম্পর্ক হবে তার থেকে শুধু পশ্চিমবাংলার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক একটু আলাদা হবেই। শুধু ভাষা বা সাংস্কৃতিক বন্ধনই নয়, দু'দিকেই রয়েছে প্রচুর আত্মীয়স্বজন, সোজা পথে না হলে, বাঁকা পথেই চলবে অনবরত যাতায়াত।

ভারত সরকার যদি বাংলাদেশের সঙ্গে শুধু শুকনো বাণিজ্যিক সম্পর্ক, গালভরা বন্ধুত্ব আর শান্তির কথা বলেই দায়িত্ব শেষ করতে চান, তাহলে সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কি কোনো দায়িত্ব নেই? আমাদের সঙ্গে ওদের সম্পর্কটা পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের নিয়মের মধ্যে পড়ে না। ওদিকের সঙ্গে এদিকের বইপত্রের বিনিময় কেন স্বাভাবিক হলো না—সে-সম্পর্কে ভারত সরকারের মাথাব্যথা না থাকতে পারে, আমাদেরও থাকবে না? দুই দেশের চলচ্চিত্র বিনিময়ের প্রশ্নে. ভারত সরকার যদি কোটা করে দিতে চান এবং বাংলাদেশ যদি তামিল বা হিন্দি ফিল্ম নিতে অস্বীকার করে, তাহলে সে-সম্পর্কে আমাদেব কোনো বক্তব্য নেই? দুর্ভিক্ষে অনাহারে যদি ওদিক থেকে কিছু লোক এদিকে চলে আসে, ভারত সরকার বলবেন, এবং বলছেন, ওদের ঠেলে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হোক, কারণ অন্য দেশের নাগরিকদের দায়িত্ব আমরা

নিতে পারি না। কিন্তু আমাদেরই মামা-কাকা কিংবা বড়ো ভাই-দুলহাভাই যদি এদিকে আসতে চায়, আমরা তাদের তাড়াব ? এই ব্যাপারটা দিল্লি কি করে বুঝবে ? বা, কেউ কি বুঝবার চেষ্টা করছে ? সংসদের মুখর সদস্যরাও এই ব্যাপারে চুপ।

বাংলাদেশ সম্পর্কে এদিকে এখন নির্বিকার উদাসীন মনোভাব। হঠাৎ বিশ্বাসই করা যায় না, মাত্র তিন বছর আগে কি দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল এদিকে, কত চাঁদা তোলা হয়েছে, কত গান বাঁধা হয়েছে! ওদিকে ভারত-বিরোধী প্রচারের কথা শুনলে আমরা এদিকে অবহেলায় কাঁধ ঝাঁকাই. খবরের কাগজ গুলিও এ-সম্পর্কে চুপচাপ থাকার নীতি নিয়েছে। নিভৃত আলোচনায় অনেকে আশাভঙ্গের কথা প্রকাশ করেন, কেউ কেউ বলেন, ওরা অকৃতজ্ঞ। এসবই অস্থির সিদ্ধান্ত।

সত্যি, ওদিকে ভারতবিরোধী মনোভাব এবং প্রচার যথেষ্ট প্রবল। ওদিকে অনেকেই মনে করে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ব্যপারে ভারত যে সাহায্য করেছে, তা নিতান্তই নিজের স্বার্থে এবং এখন সেটা উসুল করার জন্যই পুরোপুরি শোষণ চালাচ্ছে। ঠিক কিভাবে যে শোষণ হচ্ছে সে-সম্পর্কে অবশ্য কারুর কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। ওদিকের কিছু সংবাদপত্রে এমন সব সংখ্যাতত্ত্ব মাঝে মাঝে চোখে পড়ে, যা দেখলে হাসি পায়। বর্তমান বাংলাদেশের অধিবাসীরা বেশ কিছু বছর সামরিক শাসনের অধীনে ছিলেন। মিথ্যা সংখ্যাতত্ত্ব এবং কৃত্রিম দেশপ্রেমের প্রচার সামরিক শাসনের বিশেষ একটি অস্ত্র, ওদিকে তার কিছু রেশ থেকে যাওয়া এখনো অস্বাভাবিক নয়। তবে, ভারতীয় অসাধু ব্যবসায়ীরা যে প্রথম থেকেই ওদিকে অতি নিম্নমানের জিনিসপত্র পাঠিয়েছে, তা আমরা নিজেরাই দেখেছি। ভারত সরকার এটা যে দমন করতে পারেননি, সেজন্য গঞ্জনা ও ভর্ৎসনা তাঁর প্রাপ্য। আবার নিজের দেশের সীমান্তে চোরাচালান বন্ধ করতে না পারা যে নিজেদের সরকারেরই ব্যর্থতা, সেটা বাংলাদেশের অনেকেই ভুলে যান। বাংলাদেশের টাকার মান বেসরকারিভাবে ভারতীয় টাকার অর্ধেক, এজন্য ওদিকের অনেকেই ক্ষুব্ধ এবং সাধারণ লোকেরা এটাকেও ভারতীয় শোষণের অঙ্গ হিসেবে ধরে নিয়েছেন এবং ওদেশের অর্থনীতিবিদরা এই ভুলটাও ভেঙে দিচ্ছেন না। মনে করিয়ে দিচ্ছেন না যে বাংলাদেশে সোনার দাম ভারতের দ্বিগুণ। যেমন, জাপানের তুলনায় ভারতের টাকার দাম অনেক কম। এর কারণ এই নয় যে জাপান ভারতকে শোষণ করছে, কারণ, ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থা অনেক দুর্বল।

পাকিস্তানের স্বীকৃতিদানের উল্লাসে কিংবা ঢাকায় ভুট্টোর বিপুল সম্বর্ধনায় অনেকের মনে হয়েছে, বাংলাদেশে এখনো অনেকে পাকিস্তানের সমর্থক। এমন কথাও ওদিকে উচ্চারিত হয়েছে, স্বাধীন হয়ে আমাদের কি লাভ হলো, আগেই তো ভালো ছিলাম। এটা খুব অস্বাভাবিক কি? স্বাধীনতা একটা ভাববস্তু, তার চেয়ে খাদ্যদ্রব্য অনেক বেশি আপন এবং জরুরি। ১৯৪৮ থেকে ৫০ সালের মধ্যে কলকাতার পথেঘাটেও অনেকে বলেছে, স্বাধীন হয়ে কি লাভটা হলো, এর চেয়ে ব্রিটিশরা ভালো ছিল।

ওদিকে সাম্প্রদায়িকতাও বেশ মাথা চাড়া দিয়েছে। বাংলাদেশের আগে, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো মুসলমান রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ হিসেবে ঘোষিত হয়নি। সুতরাং ব্যাপারটা দু'-এক বছরে মেনে নেওয়া সহজ নয়। ভারতেও সাম্প্রদায়িকতা বারবার বিপত্তি ঘটিয়েছে এবং অনেক চেষ্টা হয়েছে তাকে শান্ত করার এবং এখনো যে তা নির্মূল হয়েছে, তা মোটেই বলা যায় না। তবে, ভারতের কোনো একটিও সরকারি নীতি যে সাম্প্রদায়িক নয় এবং সাম্প্রদায়িকতা রুখতে সরকার যে বারবার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, এ কথা স্পষ্টভাবে বলা যায়, এজন্য অন্তত একটি সাধুবাদ দিতেই হবে। বাংলাদেশ সরকার এতটা সজাগ কিনা আমরা জানি না। অভাব এবং দারিদ্র্যেই সাম্প্রদায়িকতা বাড়ে। ধর্মের ভূত আরো কত শতাব্দী মানুষের ঘাড়ে চেপে বসে থাকবে কি জানি। নিতান্ত পাশবিক স্বার্থকে উস্কানি দেওয়া ছাড়া ধর্মের আর কোনো সামাজিক ভূমিকা তো দেখি না! বাংলাদেশে ভারতবিরোধী প্রচারে যে সাম্প্রদায়িকতাকেও পরোক্ষে উস্কানি দেওয়া হয়, একথা দায়িত্বশীল মহলের মনে রাখা উচিত।

বাংলাদেশের তুলনায় ভারত এমনই বেঢপ রকমের বিশাল যে ঐ দেশকে শোষণ করে ভারতের কণামাত্র সমৃদ্ধি বাড়বে না। অপরদিকে বাংলাদেশের সঙ্গে উদারনৈতিক বাণিজ্যেও আর কী বাড়বে ভারতের দারিদ্র্য? বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় ভারতের একমাত্র প্রত্যক্ষ লাভ—সীমান্তে সৈন্যসমাবেশ না ঘটিয়ে খরচ বাঁচানো। দিল্লি সরকার শুধু এইটুকুই বুঝেই যদি নির্লিপ্ত থাকেন, তবে সেটা হবে আর একটা ভুল। যুদ্ধ-বিগ্রহের পরেরকার অবস্থাই বেশি ভয়াবহ। দুটো দেশই যদিও ধুঁকছে, কিন্তু ভারতের এই অবস্থাটা বাংলাদেশে স্পষ্ট নয়। বাংলাদেশের ব্যাপারে দিল্লির প্রশান্ত গাম্ভীর্য দেখলে অন্যরকম মনে হবারই কথা। বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতের সামান্য ক্ষতি স্বীকার করাও যুক্তিযুক্ত, আমরা মনে করি। এখানে কৃতজ্ঞতার কথাও অর্থহীন। কৃতজ্ঞতা জিনিসটা ব্যক্তি-

জীবনেই যথেষ্ট নড়বড়ে, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রশ্নই ওঠে না।

ভারত সরকার যদি এ ব্যাপারে নির্বিকার থাকেন, তবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের নিশ্চিত বারবার সেটা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। গোটা ভারতবর্ষের তুলনায় শুধু পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের যে আলাদা একটা বিশেষ সম্পর্ক থাকবে এবং থাকতে বাধ্য, এ প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কেন তুলছেন না? আমরা আবার বলছি, পশ্চিমবঙ্গের এই চোখ বুজে থাকা নীতি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর।

কিছুকাল আগে কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের নিমন্ত্রণে আমি শিমুলতলা গিয়েছিলাম। তাঁরা আমাকে একটি প্রথম শ্রেণীর টিকিট দিয়েছিলেন। যথা সময়ে আমি একা হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত। অপেক্ষমাণ রেলগাড়ির প্রথম শ্রেণীর বগির দরজার বাইরে সাঁটা কাগজে আমার ও অপর একজন যাত্রীর নাম শুধু মুদ্রিত। কিন্তু দরজার কুলুপ বন্ধ। কাছাকাছি কোনো রেল কর্মচারীকে দেখি না। দূরে সঞ্চরণশীল সাদা প্যান্টালুন ও কালো কোর্তা পরিহিত যে ব্যক্তিকেই এ ব্যাপারে প্রশ্ন করি, তিনিই উদাসীনভাবে উত্তর দেন, ও আমার কার্য নয়। তখন পুরো প্ল্যাটফর্ম হেঁটে এসে লৌহ-দরজার পাশে টিকিট আদায়রত পাকা দু'জন রেলকর্মীকে আমার সমস্যার কথা জানাই. তাঁরাও একইভাবে উত্তর দেন, কামরার কুলুপ খোলা ভিন্ন ব্যক্তির কর্ম। সেই ভিন্ন ব্যক্তিকে কোথায় পাওয়া যাবে, এ ব্যাপারে তাঁরা আমারই মতন অজ্ঞ।

শেষ মুহূর্তের এক মিনিট আগে সেখানে একজন রেলকর্মী এসে দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করি। তৎক্ষণাৎ বিকট দুর্গন্ধে আমাকে আবার বাইরে আসতে হয়। ভিতরে কিছু মরে পচে আছে, এরকম সন্দেহই মনে জাগে। রেলকর্মীকে একথা জানালে তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে, কামরায় প্রবেশ করে শৌচাগারের খোলা দরজাটি টেনে বন্ধ করে দেন। এবং আমাকে ভেতরে যাবার ইঙ্গিত করেন। শৌচাগারের মধ্যে কি আছে জানতে চাইলে, তিনি একপ্রকার মুখভঙ্গি করেন মাত্র, কোনো উত্তর দেন না। মনে হয়, অতিরিক্ত বাক্যব্যয়ে আয়ুক্ষয় হয়, তিনি এই নীতিতে বিশ্বাসী। যাই হোক, কামরায় আমি ঈষৎ ভয়ে

ভয়ে আবার প্রবেশ করি। ভিতরের দৃশ্য দেখে মন আবার দমে যায়। বসবার আসনগুলি কোনো এককালে গদি ও রেক্সিনে ভূষিত ছিল, এখন তা আগাগোড়া চটে মোড়া, বড়ো বড়ো শেলাই, এবং সেই চটেও আলকাতরা এবং অচেনা কিছুর নানা বর্ণের ছোপ। সর্বত্র পুরু ধুলো, একটিও পাখা নেই, তার বদলে শিরা উপ-শিরার মতন তার ঝুলছে। গত সেপ্টেম্বর মাসের কথা, তখন বেশ গরমকাল।

প্রথম শ্রেণীতে আরোহণ করলেই কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার দাবি আমাদের মধ্যে জেগে ওঠেই। আমরা এর চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থায় রেল ভ্রমণ করেছি যদিও, কিন্তু পকেটে প্রথম শ্রেণীর টিকিট থাকায় আমি তখন বেশ উষ্ণ বোধ করি। দরজার কাছে এসে কণ্ডাকটারবাবুকে বলি, কামরার একি অবস্থা? অন্তত একবার ঝাঁট দেবার ব্যবস্থাও···

তিনি আমার মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকেন। কি ঠাণ্ডা সেই দৃষ্টি! তারপর খুব আস্তে আস্তে বললেন, আমার থেকে অনেক অনেক কোনো ওপরওয়ালা, যাকে লিখলে কাজ হয়, সেরকম কারুর কাছে অভিযোগ করুন।

একসময় ওপরওয়ালা বলতে ঈশ্বরকে বোঝাত। তিনি বোধহয় সেই রকমই কোনো মহাপুরুষ সম্পর্কে ইঙ্গিত করলেন।

যাই হোক, এই উত্তরে এমন কিছু বিশেষত্ব নেই। কিন্তু আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম লোকটির কণ্ঠস্বরের তিক্ততায়। একজন মানুষ অপর একজন মানুষের সঙ্গে, যে তার শত্রু নয়, এমন তিক্তস্বরে কথা বলে কি কারণে? হয়তো প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের সম্পর্কেই এঁর একটা জাতক্রোধ আছে! ট্রেনে এ-রকম প্রথম শ্রেণী থাকে কেন? পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ আমেরিকাতেও রেলগাড়িতে কোনো শ্রেণীবৈষম্য নেই।

কিংবা এমনও হতে পারে, কিছুকাল আগেকার রেল ধর্মঘটের ব্যর্থতার গ্লানি ওঁর ওষ্ঠে এখনো লেগে আছে। এই পরাজয় সকল রেল-কর্মচারীর মনে একটা গভীর আঘাত দিয়েছে, আমরা জানি। সেইজন্যই কাজে কোনো উৎসাহ নেই। আর কোনো অভিযোগ জানাবার বদলে আমি লোকটির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে পড়ি। যুক্তিহীন ভাবেও আমরা অনেক সময় ব্যর্থ পরাজিত মানুষদের দিকে চলে যাই।

রেলগাড়িটির নাম লখনৌ এক্সপ্রেস। ছাড়ে দুপুরে। সেদিন মাত্র দশ মিনিট দেরিতে ছেড়ে ছিল, এবং শেষ মুহূর্তে কামরাটি যাত্রীতে ভরে যায়। কারুর সঙ্গে কোনো মালপত্র নেই, বেশ ঝাড়া হাত-পা যাত্রী। তাঁদের নিজেদের মধ্যের

কথাবার্তায় বুঝতে পারি, অনেকেই রেল-কর্মচারী। কেউ কেউ কামরার অবস্থা সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন। সেই সময় তাঁরা আর রেলকর্মী নন্, যাত্রী, সেইজন্যই যাত্রীসুলভ অভিযোগ।

মাঝে মাঝে দু'-একজন শৌচাগারের দিকে গিয়ে দরজা খুলেই নাকে কাপড় দিয়ে ফিরে আসছিলেন। আমার ভয় হলো, ওর মধ্যে হয়তো কোনো মৃতদেহ আছে। আমি সেদিকে একবারও যাইনি।

সন্ধ্যার কিছু পরে, চিত্তরঞ্জন স্টেশনে কামরাটি সম্পূর্ণ খালি হয়ে যায়। একাকিত্বে আমি হৃষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু তখনই ওপর থেকে একটি দোহারা চেহারার লোক নিচে লাফিয়ে পড়ে এবং চমকিত আমাকে ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করে, আপনি কতদূর যাবেন?

লোকটির কথা শুনে জানা যায় যে তিনি জানেন রাত্রের দিকে এই ট্রেন ফাঁকা যায়। আগে সবকটি খোপ ঘুরে তিনি দেখেছেন, যে শুধু আমার সঙ্গেই মালপত্র আছে, তাই তিনি আমার সঙ্গী হয়েছেন। পথে নাকি ডাকাতির ভয় আছে। তিনি শেষ রাত্রে পাটনায় নামবেন। আমি রাত্রি দশটাতেই নেমে যাব শুনে তিনি রীতিমতন মুষড়ে পড়েন। কামরায় আলো অতি ক্ষীণ। ঐ আলোতে বই-ও পড়া যায় না। এই আলোর অভাবেই আমি সবচেয়ে বেশি দুঃখিত হয়েছিলাম। সন্ধ্যার পর কোনো একা-যাত্রীর বই পড়া ছাড়া আর কি কাজ থাকতে পারে? আমি এমনই বিরক্ত হয়েছিলাম যে অনেকখানি পথ দাঁড়িয়ে থেকে, হাত উঁচু করে বইটাকে আলোর কাছে নিয়ে অতি কষ্টে পড়তে পড়তে কালহরণ করেছিলাম।

এই ঘটনার মাসাধিক কাল পরে, কয়েকজন শ্রদ্ধেয়, বন্ধু ও সহকর্মীর সঙ্গে বর্ধমান থেকে একটি অল্প-পাল্লার রেলগাড়িতে কলকাতায় ফিরছিলাম। তৃতীয় শ্রেণীতে। বেশ আরামদায়ক বসবার জায়গা পেয়ে গিয়ে বেশ অবাক হয়েছিলাম প্রথমে।

পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই পিলপিল করে লোক উঠতে লাগল। নারী-শিশু-জোয়ান-বৃদ্ধ, প্রত্যেকের সঙ্গে বিভিন্ন আকারের পুঁটুলি। চালের চোরা-চালান সম্পর্কে আমরা আগে অনেক শুনেছি, সংবাদপত্রে পড়েছি, কিন্তু তার আকার যে এত বৃহৎ—নিজের চোখে না দেখে আগে বুঝতে পারিনি। শুধু আমাদের কামরাতেই অন্তত পঞ্চাশ থেকে ষাটজন ছিল চালের পুঁটুলি সমেত। মানুষের অসম্ভব ভিড়ে ও ঘামের গন্ধে সেই কামরায় এমন একটা পরিবেশ হলো,

যাতে মনে হয়, টিনে বন্ধ সার্ডিন মাছেরা এর চেয়ে অনেক আরামে থাকে।

সেই কামরায় দেখলাম, অনেক রকম মূল্যবোধও বদলে গেছে। যুবতী নারীরা স্বেচ্ছায় পুরুষদের ধাক্কা দেয়, পুরুষরা নারীদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে স্থান নিতে চায়—আপনার পায়ের কাছে এসে বসবে বৃদ্ধরা, আসনের নিচে ঢুকে যাবে বালক। চালের তুলনায় শরীরের কোনো দামই নেই। আমরা প্রশ্ন করে জেনেছি, এই চোরাচালানীরা মাসের পর মাস ভাত খায় না। রুটি পেলেই যথেষ্ট খুশি হয়। সমগ্র যাত্রাপথে একটিবারও কেউ টিকিট পরীক্ষা করতে আসেনি, চাল-পসারীদের কোনোভাবে বাধা দিতে আসেনি কেউ। সমগ্র রেল-গাড়িটিতে নগণ্য সংখ্যক টিকিট-কাটা যাত্রীরাই একেবারে দুয়ো হয়ে বসে ছিল।

এই দুটি পৃথক চিত্র আমরা আগামীকালের রেল-যাত্রাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে রাখলাম।

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই বাংলা বৎসরে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন, এজন্য আমরা সকলেই আনন্দিত। তাঁর 'উলঙ্গ রাজা' কাব্যগ্রন্থটি আমাদের বিশেষ প্রিয়। আগামী ১৮ জানুয়ারি একটি ঘরোয়া সভায়, ২৭ জি কলেজ স্ট্রিট, ইণ্ডো জি ডি আর হলে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী "কৃত্তিবাস ও আমি" এই নিজ-নির্বাচিত বিষয়ে কিছু বলবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য বেরুতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় একজন এসে বলল, উত্তর কলকাতার কোনো রেশনের দোকানে চাল গম নেই। শুভ কাজের শুরুতেই একটা বাধা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, একেবারে বিলিতি জিনিসের মতন চমৎকার একটি স্টেডিয়াম তৈরি করে কলকাতা এবারে সারা ভারত তথা বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। এই কৃতিত্বের অনেকখানিই মুখ্যমন্ত্রীর প্রাপ্য, সেই মুহূর্তে সামান্য চাল-গমের কথা শুনলে মনে হতেই পারে, উঃ, আর পারা যায় না। একটুক্ষণও কি শান্তিতে থাকতে দেবে না! এফ. সি. আই-এর কর্মীরা ধর্মঘট করার আর সময় পেল না।

যে দেশের লোক এখনো খেতে পায় না, সে দেশে এরকম স্টেডিয়াম তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, আমরা সে প্রশ্নে যাচ্ছি না। এদেশ বহুকাল ধরেই গরিব এবং লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে আরও বহু বছরই গরিব থাকবে। সুতরাং অন্যসব ক্রিয়াকলাপ থেমে থাকতে পারে না। আমাদের এই রাজ্যে যিনি খেলাধুলা বিষয়ের মন্ত্রী, তিনিই খাদ্যমন্ত্রী। পা ভেঙে যাওয়ায় তাঁকে চিকিৎসার কারণে দীর্ঘদিন বিলেত-আমেরিকায় থাকতে হয়, ইদানীং আবার তিনি হৃদরোগে ভুগছেন বলে চিকিৎসকরা প্রায়ই তাঁকে চার-পাঁচদিনের পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেন। তবুও তাঁকে মন্ত্রী থাকতেই হবে। সম্ভবত তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করেই তাঁকে খেলা ও খাদ্যের মতন দুটি হালকা বিভাগ দেওয়া হয়েছে।

এ রাজ্যে খেলাধুলার ব্যাপারটা বেশ ভালোই চলছে বলা যায়। গত ক্রিকেট টেস্টম্যাচ এবং চলন্ত টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনার সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে সাধুবাদ করছেন, আমরাও করি, অথচ, রেশনের দোকানের ভাঁড়ার শূন্য থাকে কেন? একই মন্ত্রীর দুই দপ্তরের মধ্যে একটি ভালো চলছে, অপরটি চলছে না কেন? মনে হয়, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অসুস্থতা কিংবা অনুপস্থিতির সময় তাঁকে সাহায্য করতে, তাঁর বোঝা হালকা করার জন্য খেলাধুলা বিভাগের কাজকর্ম অন্যরা ভাগাভাগি করে নিতে বেশ আগ্রহী। কিন্তু খাদ্যের ব্যাপারে অন্য সবাই হাত ধুয়ে বসে আছেন, কেউ কিছুই জানেন না। তবে, যেহেতু সব ব্যাপারেরই পরোক্ষ দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর, তাই তাঁকে বিড়ম্বিত হতে হয়। জরুরি কাজে দিল্লিতে গিয়েও তাঁকে উদ্বিগ্নভাবে খবর পাঠাতে হয়, কেউ কি কোনোক্রমে এখন ধর্মঘটটা মিটিয়ে ফেলতে পারে না! সত্যিই তো, যখন সারা বিশ্বের প্রতিনিধিরা, এমনকি চীনের একজন উপমন্ত্রী পর্যন্ত কলকাতায় উপস্থিত, তখনই এই কেলেঙ্কারি!

পরের স্বগত প্রশ্নটি এই, এফ. সি. আই-এর কর্মীরাই বা হঠাৎ হঠাৎ এরকম ধর্মঘট করে কেন? এই কর্মীরা তো বিদেশী নয়, কোন নরখাদক সম্প্রদায়েরও নয়, আমাদেরই চেনাশুনো সাধারণ চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষ, তবু হাজার হাজার নিরীহ লোককে অনাহারে রেখে এদের আন্দোলন চলে কেন? এদের সঙ্গে মিটমাটের প্রস্তাবের কথা শুনি! কিন্তু এদের প্রকৃত দাবি কি, কেন এরা এরকম মরিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তা আমরা জানতে পারি না। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ইউনিয়নটি আবার কংগ্রেসের, অথচ কংগ্রেস সরকারকেই এরা অপদস্থ করছে। আমরা শুনেছিলাম, দিল্লি ঘুরে আসার পর আমাদের যুব নেতাদের—

যাঁরা ইউনিয়নগুলি ভাগাভাগি করে নিয়েছেন, অন্তর্কলহ মিটে গেছে—তবু কেন রেশনের দোকানে তালাবন্ধ থাকে, এটা একটা রহস্য ছাড়া কি?

একটা প্রশ্ন প্রায়ই মাথায় ঘোরাফেরা করে ইদানীং। ভারতবর্ষের নানা বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ধর্মঘটের চেহারাকে কেন্দ্র করেই এই প্রশ্ন। রোদ বৃষ্টি বাতাসের মতনই ধর্মঘট এখন আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিদিনকার ব্যাপার। ভ্রাম্যমাণ সার্কাসের মতো তা স্থান পরিবর্তন করলেও সব সময়ে কোথাও-না-কোথাও ঘটছেই।

ধর্মঘট তো ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ন্যায়সঙ্গত অধিকার। দাবি আদায়ের আর কি পথ আছে? জমিদারি যুগে অনুনয়-বিনয় কাকুতি-মিনতিতে কখনো হঠাৎ কিছু সুযোগ-সুবিধে আদায় করা যেত। বৈশ্য যুগে সেটা সম্ভব নয়। এখন মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে সব সময়েই একটা কাড়াকাড়ির ব্যাপার আছে। আমাদের প্রশ্ন ধর্মঘট সম্পর্কে নয়, ধর্মঘটের চরিত্র সম্পর্কে।

এই ভূ-ভারতে কেউই সন্তুষ্ট নয়। ভারতে সর্বোচ্চ বেতনধারী পাইলটরাও ধর্মঘট করে। কেন? সম্ভবত এই কারণে যে, যে-বিমান তারা চালায় সেই বিমানের যাত্রীরা আরো অনেক বেশি ধনী বলে তাদের ঈর্ষা হয়। হতেই তো পারে? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা স্টেট ব্যাঙ্কের প্রথম শ্রেণীর অফিসাররা যখন ধর্মঘট করে, তখনও সম্ভবত কারণ ঐ একই, ব্যাঙ্কে যারা টাকা রাখে বা তোলে, তারা অনেকেই বেশি ধনী। ডাক্তাররা ধর্মঘট করে ইঞ্জিনিয়ারদের তুলনায় তাদের মাইনে এবং চাকরির শর্ত খারাপ বলে। ইঞ্জিনিয়াররা ধর্মঘট করে কারণ তাদের তুলনায় সমান যোগ্যতাসম্পন্ন রাজপুরুষেরা বেশি ক্ষমতা ও হুকুমের অধিকারী। কোনো ধর্মঘটেরই অবশ্য সঠিক মীমাংসা এ পর্যন্ত হয়নি, ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়, মাঝে মাঝে ধামার তলা থেকে সাপ বেরিয়ে আসে।

বন্দর-শ্রমিক ধর্মঘট কিংবা খাদ্য-গুদামকর্মীদের ধর্মঘট আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কেউ গ্রাহ্য করেনি। গ্রেফতারের হুমকি দেওয়া হয়েছে, কোনো কাজ হয় না তাতে—একজন কর্মীকে গ্রেফতার বা ছাঁটাই করলে নতুন ধর্মঘট শুরু হয়। হাসপাতালে জুয়াড়ি ও মদ চোলাইকারী চতুর্থ শ্রেণীর একজন কর্মচারীকেও

বদলি করা পর্যন্ত সম্ভব হয় না। ভারতের সবচেয়ে সুখ্যাত ভেলোর হাসপাতাল এই কারণে বন্ধ হবার মুখে।

একজন কর্মীকে ছাঁটাই করলে তার পরিবার অনাহারের সম্মুখীন হয়। তাকে বাঁচাবার জন্য ধর্মঘট হলে বহু পরিবার বিপন্ন হয়। এর নীতিবোধটা কি? একজন চোরকে যদি শাস্তি দেওয়া হয়, তাহলেও তার স্ত্রী-পুত্র খেতে পাবে না—এবং তারা চোরও নয় এবং সমাজের কাছে কোনও অপরাধ করেনি। এর মধ্যেই বা নীতিবোধটা কি? লালবাহাদুর শাস্ত্রী একবার বলেছিলেন, রেল বিভাগে চুরি বন্ধ হলে সারা ভারতবর্ষে সোনার রেললাইন পাতা যেত।

আপাতত আমাদের মনে হয়, কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠী যখন ধর্মঘট করে, তখন তারা সারা দেশের সুবিধে-অসুবিধের কথা তোয়াক্কাই করে না। আবার তারা যদি সারা দেশের জন্য বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ে, তাহলে আবার নিজেদের প্রাপ্য পায় না। ছাত্রদের পড়াশুনো নষ্ট হচ্ছে বলে শিক্ষকরা যদি ধর্মঘট করে, তা হলে তাদের চিরকালই বুনো রামনাথ হয়ে থাকতে হয়। অর্থাৎ ধর্মঘট না করলে কোনো দাবিদাওয়া মেটার সম্ভাবনা এদেশে নেই, অথচ ধর্মঘট হলেই বাকি সম্প্রদায়ের মুখে একটা দুঃখের ছাপ পড়ে, মনে হয় দেশের একটা দারুণ ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।

সভ্য হলেও মানুষের স্বভাব এখন উপজাতিসুলভ। পাইলট থেকে শুরু করে হাসপাতালের ধাঙড় সবাই নিজেদের গোষ্ঠী-স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করে না। পুরো দেশের সমতা রক্ষার ভার যাঁদের ওপর, তাঁরাও এ পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান করার কোনো ব্যবস্থা করেননি। অন্তত চিন্তাও করছেন কি

তিরিশ বছর পর ভিয়েতনামের যুদ্ধ শেষ হলো। এই যুদ্ধে আমেরিকানরা সামরিক এবং নৈতিকভাবে পরাজিত হয়েছে, তাদের জাতীয় ইতিহাসে এই প্রথম পরাজয়। এই যুদ্ধে তাদের অর্থব্যয় হয়েছে এমন একটি সংখ্যায়, যে রকম সাধারণত আকাশের তারার দূরত্ব গণনার সময়েই ব্যবহৃত হয় (১৫০০০ কোটি ডলার)। অর্থাৎ ১,২০০০,০০০০০০০০ টাকা প্রায়। এবং প্রাণ দিয়েছে

৫৬৫৫০টি যুবক—যার বিনিময়ে সে-দেশ কিছুই পায়নি।

আশ্চর্যের ব্যাপার, এত বড়ো একটা যুদ্ধ শেষ হবার পরেও যে বিপুল উল্লাস, উত্তেজনা, তর্কাতর্কি, নিন্দাবাদের ঝড় ওঠার কথা ছিল, তার কিছুই হলো না। যেন একটা ঠাণ্ডা উদাসীন ভাব। এত দীর্ঘকাল চলেছিল বলেই হয়তো এই যুদ্ধ বিষয়ে একটা একঘেয়েমির ভাব এসে গিয়েছিল। প্রতিদিন হাজার দু' হাজার মৃত্যুও আর বড়ো সংবাদ হতো না ইদানীং। ফলে, যুদ্ধ সমাপ্তির ঘটনাও নিরুত্তাপ ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিংবা, সবাই আজ জেনে গেছে যে পৃথিবীর যে-কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাই আসলে পৃথিবীর তিনটি বৃহৎ শক্তির পাশা খেলা। চীনের সঙ্গে আমেরিকার সদ্ভাব স্থাপনের পরেই ভিয়েতনাম যুদ্ধের তাৎপর্য নষ্ট হয়ে গেছে। তবে আর কেন যুদ্ধ? কিসের যুদ্ধ? মার্কিন প্রেসিডেন্ট চীনে যান খানা খেতে, মস্কোর কার্ল মার্কস অ্যাভিনিউতে খোলা হয় আমেরিকার রকফেলার ব্যাঙ্ক—তবে আর ভিয়েতনাম কোন্ আদর্শের লড়াই? সমস্ত আদর্শবাদই এখন পরিণত হয়েছে জাতীয়তাবাদে। স্বজাতির স্বার্থ ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক স্বার্থ নেই, মুখে যে-যাই বলুক! ভিয়েতনাম যুদ্ধ উপলক্ষে এই দুঃখজনক উপলব্ধিটিই আর একবার প্রমাণিত হলো। মানবসভ্যতা এখনো এইখানে থেমে আছে, হয়তো এই পর্যন্তই থাকবে।

এই যুদ্ধ সমাপ্তির পরও অন্তত দুটি বিষয় পরবর্তীকালের জন্য জানিয়ে রাখা দরকার। উত্তর ভিয়েতনামীরা এই শতাব্দীর সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধা। আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য তারা যে-লড়াই করেছে—আজ পর্যন্ত কোনো সাহেব জাতিও সে-রকম সাহস দেখাতে পারেনি। তাদের দুই মুরুব্বি যখন আলাদা-আলাদা-ভাবে তাদের পরম শত্রুর সঙ্গে আঁতাত করেছে, তখনও এই গরিব দেশটির কৃশকায় লোকগুলি তাদের মাথা এবং পতাকা উঁচু রেখেছে। দ্বিতীয় ঘটনাটি এই, এই যুদ্ধ চলার মধ্যেই নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এমন এক ব্যক্তিকে, যিনি সেই পুরস্কার গ্রহণ করার পরেও আরও হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর পরোক্ষ কারণ হয়েছেন। হায় শান্তি, হায় তার পুরস্কার! এখন আমেরিকার অর্ধ লক্ষ জননী বা যুবতী ভাবছে, কেন তাদের পুত্র বা প্রেমিকরা হাজার মাইল দূরে জল-কাদার মধ্যে কুকুর-বেড়ালের মতন প্রাণ দিল? বিনিময়ে সামান্য সম্মানটুকুও পেল না। আর কয়েক লক্ষ ভিয়েতনামী এবং কম্বোজীয়র মৃত্যু? সে কিছুই না। এশিয়ার গরিব দেশগুলির মানুষের আবার প্রাণের দাম আছে নাকি?

রবীন্দ্রনাথ

তাঁর যদি ভক্তদের সম্পর্কে সামান্য মায়া-দয়া থাকত, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বেছে-টেছে শীতকালের কোনো একটা মনোরম দিনে জন্মাতেন। কী অসহ্য গরম ছিল এবারও পঁচিশে বৈশাখে। তবু সেই সকালেই একটা অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য দেখলাম। রবীন্দ্রসদনের প্রাঙ্গণে ছিল একটি অনুষ্ঠান, একটি শামিয়ানাও খাটানো হয়েছিল, কিন্তু তার নিচে স্থান হবে ক'জনের? অন্তত আট-দশ হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছে সেখানে, তারা বসেছে সিঁড়িতে, গাছতলায়, খোলা মাঠে, এমনকি রাস্তার ওপরে—মাথার ওপরে ঠা-ঠা করছে রোদ্দুর, একশো দশ ডিগ্রি। অধিকাংশই অল্প বয়েসী ছেলেমেয়ে, ঘামে ভেজা উজ্জ্বল মুখ, কোনো কোলাহল নেই, বিশৃঙ্খলা নেই, পুলিশ নেই। এই উপলক্ষে পর্যাপ্ত জল সরবরাহের দায়িত্ব নেয়নি কোনো প্রতিষ্ঠান, তবু এমন একটা সুন্দর দৃশ্য বহুদিন দেখিনি। জোড়া-সাঁকোতেও এই একই দৃশ্য।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের যুবসমাজকে এখনও এতটা আকৃষ্ট করেন! আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের তিনিই যে এখনো মূল স্তম্ভ, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আর কার গান শুনতে এত আগ্রহ, আর কার কবিতায় এমন সার্বজনীন শিহরণ?

যুবসমাজের এই আগ্রহের তুলনায় সরকারি সাহায্য বা বিশ্বভারতীর উদ্যোগ অনেকটাই নিরর্থক। আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিজের মতন করে গ্রহণ করেছি—এতে অন্য কারুর হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষ করে বলা দরকার। সম্প্রতি রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে একটা অনাচার চলছে। অতি-রিক্ত আচার-নিষ্ঠা ও শুচিবাই এই অনাচারকে ডেকে আনছে। রবীন্দ্র-সংগীতের স্বরলিপি ও গায়কী নিয়ে এমন একটা কড়াকড়ির ভাব দেখা দিয়েছে, যার ফলে এই গানে ধরে যাচ্ছে একঘেয়েমির ঘুণ। আজকাল সর্বত্র গানের স্কুল, কঠোর স্বরলিপিতে যন্ত্রসংগীত-বর্জিত শিক্ষা। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আজ-কাল রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারে। নিখুঁত ভাবে—যা আসলে অত্যন্ত যান্ত্রিক ও বিরক্তিকর। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ সংগীত রচয়িতার মতনই বহু জায়গা থেকে সুর আহরণ করেছেন, পাশ্চাত্যের সঙ্গে মিশিয়েছেন বাউল, পরীক্ষার কোনো শেষ ছিল না। সেই রবীন্দ্রসংগীতকে এখন নিয়মবন্দী করে রাখার কোনো মানে হয়? মূল সুরের কাটামো ঠিক রেখে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে নিশ্চয়ই এখনও অনেক রকম পরীক্ষা চলতে পারে। এ-ব্যাপারে নির্দেশ জারি করার জন্য কোনো কর্তৃপক্ষই উপযুক্ত নয়, গায়ক ও শ্রোতার আগ্রহই প্রধান কথা। একানব্বই সালের পর

কোন্ কর্তৃপক্ষের জারিজুরি খাটবে ? শুধু এই কটি বছরের জন্য অধিকার রক্ষার শেষ চেষ্টা বড়ো করুণ।

এর নবতম উদাহরণ দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠরোধ। এই প্রবীণ শিল্পী একানব্বই সাল পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও গান গাইতে পারবেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু তার আগেই জোর করে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাঁর গান। তাঁর অপরাধ, তিনি নানা রকম যন্ত্র-বাজনা নিয়ে পরীক্ষা করছেন। যন্ত্র কথাটার সঙ্গে বাংলা যন্ত্রণা শব্দটির ধ্বনিগত মিল আছে বলেই অনেকে সহজ ভাবে দুটিকে মিলিয়ে দেন, কিন্তু এটা যে একটা স্থূল রসিকতা—একটু ভাবলেই বোঝা যাবে।

সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, এই গোঁড়ামিপুষ্ট দলের নেতৃত্ব নিয়েছেন সন্তোষকুমার ঘোষ। এই তীক্ষ্ণধী অথচ ছটফটে মানুষটি যে কখন কি করবেন, তার ঠিক নেই। তিনি রবীন্দ্রসংগীতের প্রচণ্ড ভক্ত, আমরা জানি। রবীন্দ্র-সাহিত্যে দারুণ ভাবে মগ্ন। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের অভিভাবকত্ব বা কৌশুলি পদ নিতে গেলেন কেন ? আরও বিস্ময়ের কথা, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সব রকম স্বাধীনতায় তাঁর বিশ্বাসের কথা তিনি বহুবার প্রকাশ করেছেন, তবু এই একজন শিল্পীর স্বাধীনতা নষ্ট করছেন কেন ? দেবব্রত বিশ্বাসের পরিবেশনা তাঁর নিজের রুচিতে পছন্দ না হতে পারে—কিন্তু ঐ গান তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না, অন্য গায়করা অনায়াসেই তো ঐ গানই আবার প্রথাগত ভাবে গাইতে পারে—রবীন্দ্রসংগীতের এতে বিন্দুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। একজন যদি আলাদা ভাবে কিছু করতে চায়—তাকে করতে দেওয়া হোক, যার ভালো লাগে শুনবে, যার ভালো লাগবে না, সে অন্য গায়কদের কাছে যাবে। তার বদলে ঐ একজনের রেকর্ডই বন্ধ করে দেওয়া একটা বিশ্রী ব্যাপার।

এই সংখ্যা

এই সংখ্যায় আমরা প্রতিবেশী রাজ্যগুলির কিছু রচনা প্রকাশ করেছি। মুদ্রিত হয়েছে দুটি হিন্দী গল্প, এক-গুচ্ছ অসমীয়া কবিতা। ইংরেজি, হিন্দী ও উর্দু কবিতার যে-সব অনুবাদ দেওয়া হয়েছে—এর লেখকরা প্রায় অনেকেই কলকাতার মানুষ। কলকাতা শহরে ভারতের প্রায় সব ভাষারই কবি ও লেখকরা আছেন। আমরা ক্রমশ তাঁদের আরো বেশি রচনা প্রকাশের চেষ্টা করব। ওড়িশার কোনো গল্প বা কবিতা আমরা এ-সংখ্যায় অনেক চেষ্টা করেও সংগ্রহ করতে পারিনি। আগামী কোনো সংখ্যায় নিশ্চিত প্রকাশ করা হবে।

গত সংখ্যা কৃত্তিবাস সম্পর্কে অনেক রকম সমালোচনা শোনা গেছে। সমস্ত সমালোচনাই স্বাগত। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, কৃত্তিবাস এখনো ঠিক নির্দিষ্ট রূপ নেয়নি। নানা রকম পরীক্ষা করতে করতে এগুচ্ছে। সম্পূর্ণ অব্যবসায়িক উদ্যোগে এরকম একটি বড়ো আকারের মাসিক পত্রিকা চালিয়ে যাওয়া সহজ কথা নয়। আমরা নানা রকম চেষ্টা করে একে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তবে পাঠকরা, সাধারণত অস্থিরচিত্তই হন। গত সংখ্যার সমালোচনাগুলি পড়ে দেখা গেল, মজার ব্যাপার—আমাদের তরুণ সমাজের মধ্যে এখনো একটা নীতিবাগীশ ভাব আছে বেশ। গত সংখ্যায় যে ছটি গল্প বেরিয়েছে, সেরকম প্রথম শ্রেণীর গল্প, একসঙ্গে এতগুলি, বহুকালের মধ্যে কোনো পত্রিকার সাধারণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়নি। এছাড়া রয়েছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। অথচ, সমালোচকরা, এগুলিকে উপেক্ষা করে শুধু উষ্মা প্রকাশ করেছেন বারবধূ সম্পর্কিত আলোচনায়। বারবধূ নিয়ে যদি নাটক হতে পারে এবং লক্ষ লক্ষ দর্শক দেখতে পারে, তা নিয়ে কোনো পত্রিকায় আলোচনা হতে পারবে না? এবং আলোচনা-লেখক তাঁর নিজের মতই লিখবেন! আমরা এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে-কোনো রচনারই বিরুদ্ধ মত প্রকাশেও সমান আগ্রহী। তবে, মলাট সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছেন প্রায় সকলেই। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পুরো প্রথম মলাট জোড়া বিজ্ঞাপন আর কখনো গ্রহণ করব না।

বর্তমান সম্পাদক ছাড়াও, কৃত্তিবাসের আরো কোনো কোনো সংখ্যা আরো কেউ কেউ সম্পাদনা করতে পারেন। এটাও আমাদের পরীক্ষা। বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে আছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বরুণ চৌধুরী, সমীর রায়চৌধুরী, পার্থসারথি চৌধুরী। এঁরা বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছেন।

এই গ্রীষ্মে মানুষ বেশি বিরক্ত। এই গ্রীষ্মে আমাদের ভুরু অনেক বেশিবার কুঁচকেছে। অনেককে যখন-তখন প্রকাশ্যে কঠোর গালাগালি উচ্চারণ করতে

শুনেছি, ঠিক কারুর উদ্দেশ্যে নয়, একটা অনির্দিষ্ট রাগে।

সন্ধেবেলা যখন হঠাৎ আলো নিবে যায়, তখন হতাশা আর অবসাদে মন ভরে যায়। যেন আর কিছুই করার নেই। সমস্ত কাজ থেমে রইল, আমরা ঢুকে পড়লাম যে-যার খাঁচায়। দুপুরে পাখা বন্ধ হলেও আমরা ক্ষুব্ধ হই বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে আমরা সেটা মেনে নিতে পেরেছি। কিন্তু সন্ধের পর আলো না-থাকা যেন আমাদের হাত-পা বেঁধে পঙ্গু করে দেওয়া। মোমবাতি বা কেরোসিনের আলোতেও মানুষ একসময় সময় কাটিয়েছে বটে, কিন্তু নগরগুলি সেভাবে তৈরি হয়নি।

আলো-পাখা বন্ধ হওয়ায় আমাদের ব্যক্তিগত অসুবিধের চেয়েও আরো একটি অনেক বড়ো প্রশ্ন আছে। যখন-তখন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়ার ঘটনাটি যেন অবিকল একটি পাগল ইচ্ছেমতন মেন সুইচ বন্ধ করে দিচ্ছে যে-কোনো সময়ে। তার ফলে সারা দেশে উৎপাদন থেমে থাকছে। তার ফলে বড়ো-বড়ো কল-কারখানায় লে-অফ শুরু হয়েছে, বিপন্ন হতে বসেছে হাজার হাজার পরিবার —এসব কথা আমরা কাগজে পড়ি। এছাড়াও অনুক্ত থেকে যায় বহু ঘটনা, কত ছোটো ছোটো ফ্যাকটরিতে, দোকানে, প্রেসে, মোটর গ্যারেজে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ ছাঁটাইয়ে তারা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়, তাদের আর কোনো রোজগার থাকে না। তাদের নিজেদের কোনো দোষে নয়, শাসকশ্রেণীর কিছু পাগলাদের জন্য তাদের পরিবারের লোকেরা না খেয়ে থাকে।

১৯৭৪ সালেই বিদ্যুৎ সংকট তীব্র ছিল। তখন আমরা ভেবেছিলাম, হঠাৎ বড়ো রকমের যান্ত্রিক গোলযোগ কিংবা পরিকল্পনার ভুলে এমনটি হয়েছিল। তারপর বর্ষা এসেছে, শীত এসেছে, নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে, কত আশ্বাস-বাক্য, কত বক্তৃতা আমরা শুনেছি। আমরা একথাও শুনেছি, আমাদের নাকি বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত হতে চলেছে। আত্মতৃপ্ত সরকার বিদ্যুতের র‍্যাশনিং ব্যবস্থা পর্যন্ত তুলে দিলেন। তারপরেও, এবছরেও যদি লোডশেডিং আরো মারাত্মক হয়, তখন কি আর বলা যায়, আমরা কোনো সভ্য দেশে বাস করছি? আমাদের বিদ্যুৎমন্ত্রীর একমাত্র কাজ যা দেখতে পাচ্ছি, মাঝে মাঝে ধর্মঘটী কর্মচারীদের সঙ্গে বৈঠকে বসা। এটা একটা অসহ্য ব্যাপার!

গণ্ডগোলের সময় নিজেরই কর্মচারীদের ওপরে দোষারোপ করার একটা ঝোঁক আছে আমাদের সরকারের। যেন বিদ্যুৎ-ইঞ্জিনিয়ারদের ধর্মঘটের জন্যই বিদ্যুৎ-সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে! এটা একটা বাজে কথা! তাঁরা

ধর্মঘট করছেন কেন? ধর্মঘটের জন্য এই চরম সময়টাই বা বেছে নিলেন কেন? উত্তর খুব সোজা, এরকম ভাবে চাপ না দিলে এদেশে কোনো দাবি আদায় হয় না। কেন এল আই সি বা ব্যাঙ্কের একজন সাধারণ কর্মচারীর চেয়েও কম মাইনে নিয়ে একজন ইঞ্জিনিয়ার কাজ করবেন? বৃহত্তর দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তাঁরা তাঁদের স্বার্থত্যাগ করবেন? ওসব বাজে কথা। কে কোথায় স্বার্থ-ত্যাগ করছে? আসল কথা হচ্ছে এই, টাটা-বিড়লাদের কালো টাকা জমাবার সুযোগ না দিলে, কিংবা স্মাগলারদের জেল থেকে ছেড়ে না দিলে যেমন তারা নির্বাচনে মোটা টাকা চাঁদা দেবে না, সেইরকমই ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-শ্রমিক-কেরানীদেরও তার কিছুটা ভাগ না দিলে তারা কাজ করবে না। সরকারকে এই কথাটা বুঝতে হবে, তা যে-দলের সরকারই হোক না। এইভাবে চলতে থাকবে একটা অশুভ চক্র।

মানুষ একসময় অরণ্যের প্রাণী ছিল। ভয়াল অরণ্যে অন্য পশুদের সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় হেরে গিয়ে মানুষজাতি বাইরে বেরিয়ে আসে। আজ সেই মানুষই কৃপাপরবশ হয়ে অরণ্যকে বাঁচাতে চাইছে। ব্যাঘ্র সংরক্ষণের জন্য পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন উঠেছে।

মানুষজাতির স্বভাবই এই, সামনে যেতে যেতে সে কখনো পিছনে ফিরে তাকায়। কখনো থমকে যায়। যেমন প্রাক্তন বাসস্থানের জন্য সকলেরই মন কেমন করে, অরণ্যের জন্য আমাদের মমত্ববোধও অনেকটা সেইরকম হয়তো। বস্তুত অরণ্য থেকে নিরাপদে আসার পর আজ আমাদের অরণ্য বড়োই মনোরম মনে হয়। অরণ্যহীন পৃথিবী অন্য কোনো গ্রহের প্রাণীদের উপযুক্ত হতে পারে, মানুষের নয়।

মানুষের প্রয়োজনের মতন নৃশংস ব্যাপার আর কিছুই নেই। প্রয়োজনের খাতিরেই, জনপদ ও কলকারখানা স্থাপনের অতি ব্যস্ততায় মানুষ এলোমেলো-ভাবে অরণ্যকে ধ্বংস করেছে। যদিও সমূহ প্রয়োজনে আমরা বৃহত্তর প্রয়োজনের কথা বিস্মৃত হয়েছি। আজ আমরা বুঝতে পেরেছি, পৃথিবীকে সুস্থ করার জন্যই

বনরাজিকে বাঁচিয়ে রাখার দরকার।

এবছর ২৫ জুলাই জিম করবেটের জন্মবার্ষিকী। এই অরণ্যপ্রেমিক, এককালের বিখ্যাত শিকারি এবং পরবর্তীকালে পশুপ্রেমিক এবং ভারত-বন্ধু বিদেশিটির উদ্দেশ্যে আমাদের অভিবাদন জানাই।

এই সংখ্যায় আমরা অরণ্যসম্পদ এবং তার সংরক্ষণ-বিষয়ে কয়েকটি রচনা প্রকাশ করেছি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাই রচনাগুলি লিখেছেন। স্থানাভাবে আরো কয়েকটি রচনা এই সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না বলে আমরা দুঃখিত।

মনে করা যাক, এই গোটা পৃথিবীটা মিলে একটাই দেশ। সমস্ত মানুষ মিলে একটা জাতি। তাহলে এই পৃথিবীর অবস্থা কী রকম? মানুষের কি খুব দুঃসময়? গত পঁচিশ-তিরিশ বছরে, খাদ্যশস্য ধাতু তেল ইত্যাদির উৎপাদন বেড়েছে তিন গুণ। জনসংখ্যা বেড়েছে মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ জনসংখ্যা এখনো দ্বিগুণ হয়নি, উৎপাদন হয়েছে তিনগুণ। তাহলে তো মানুষের আরও সচ্ছল হয়ে থাকবার কথা। অথচ পৃথিবীব্যাপী ক্ষুধা বেড়েছে। কারণ, একদল বেশি খায় বা নষ্ট করে, অন্য দল কম খায় বা খেতেই পায় না।

সারা পৃথিবীতে শুধু অস্ত্রশস্ত্রের জন্যই খরচ হয় ১,৯৫,২০০০০০০০০ টাকা। সুইডেনের দাগ হ্যামারসোল্ড ফাউণ্ডেশনের এক সমীক্ষায় সম্প্রতি এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ এক জাতি হলে এর একটা পয়সাও খরচ করার প্রয়োজন হতো না, কারণ এখনো অন্য গ্রহ থেকে কেউ এসে আমাদের আক্রমণ করেনি। এমনকি অন্য গ্রহের কোনো প্রাণীর অস্তিত্বও এখনো টের পাওয়া যায়নি। এই টাকার সত্তর ভাগই খরচ করে পৃথিবীর চারটিমাত্র বড়ো দেশ। ক্ষুদে দেশগুলিও সাধ্যমতন বন্দুক বোমায় জলাঞ্জলি দেয়। দু'-এক বছরের মধ্যেই অনেক অস্ত্র পুরোনো হয়ে যায়, সেগুলি বাতিল করে আবর্জনায় ফেলে দিতে হয়।

এবার মনে করা যাক, পৃথিবীটা একটা বিরাট ফাঁকা প্রান্তর। এর মধ্যে বাড়ি, ঘর, তাজমহল, ইফেল টাওয়ার, স্ট্যাচু অব লিবার্টি, পিরামিড, ক্রেমলিন কিছুই নেই। আছে কিছু জঙ্গল, জলাশয়, পাহাড়। তার মধ্যে মধ্যে লুকিয়ে আছে

কিছু আদিম উপজাতি, হাতে শানানো অস্ত্র, একদল আর একদলকে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে, হত্যা করতে চাইছে, কেড়ে নিতে চাইছে অপরের খাদ্য ও নারী। আট-দশ হাজার বছর আগে পৃথিবীর চেহারা এরকমই ছিল। খুব একটা পাল্টেছে কি? শুধু সেই নানান উপজাতির নানান নাম হয়েছে। সাদা, কালো, বাদামি, ইসলামি, ইহুদি, খ্রিস্টানি, ক্যাপিট্যালিস্ট, বেশি লাল কম্যুনিস্ট, ফিকে লাল কম্যুনিস্ট, আমি-তোমার-দলে-খেলব-না-ভাই জাতি। আমরা যখন একা থাকি, কিংবা দু'জনের নিভৃতিতে, তখন ইচ্ছেমতন একটা আলাদা পৃথিবী বানিয়ে নিতে পারি, কিন্তু তার বাইরে আসল পৃথিবীর চেহারা এই রকমই।

ওয়েলিংটনের খুব কাছেই একটা রোগা চেহারার গলি। নামটি যদিও অনেকের জানা, তবু জায়গাটি ঠিক চেনা নয়। সেই অক্রূর দত্ত লেন দিয়ে কিছুটা হেঁটে গেলেই অনেকদিনের ঐতিহ্যবাহী তরুণ প্রেস। দরজা দিয়ে ঢুকলেই ডানদিকে অফিসঘর। সেখানে প্রায় সদাসর্বদাই বসে আছেন এক জাঁদরেল চেহারার ব্যক্তি, যাঁর গলাটি প্রচণ্ড বাজখাঁই, যখন তখন রেগে ওঠেন, অথচ যাঁর অন্তঃকরণ শিশুর মতন কোমল। ইনি হচ্ছেন গণেশ দে, ঐ প্রেসের স্বত্বাধিকারী। যে-কেউ দরজা দিয়ে ঢুকলেই এঁর প্রখর দৃষ্টি পড়বে তার ওপরে। এঁর কাছ থেকে ছাড়পত্র পেলে সে আগন্তুক ঢুকতে পারবে, ভেতরে সে হয়তো দেখতে পাবে আরো তিনজন যুবক কর্মীকে, যাদের নাম তরুণ, সুকুমার ও নবকুমার। এঁদের সঙ্গেই দেখা যাবে মিলেমিশে আছেন একটি প্রায় পাকা আমের মতন চেহারার অতি নিরীহ, সদালাপী এবং মাটির মানুষ প্রৌঢ় বা প্রায়-বৃদ্ধকে যাঁর নাম আমরা সকলে শ্যামবাবু বলেই জানি, আজ পর্যন্ত পদবীটা জানা হয়নি। এঁদের পেরিয়ে গেলে খুব ছোট্ট একটি উঠোন, পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। কখনো কখনো এই সিঁড়ির মুখে দেখা পাওয়া যাবে ছোড়দা নামে এক ভদ্রলোকের, যাঁর মুখের অতি সুন্দর হাসি ছাড়া কথাবার্তা প্রায় শোনাই যায় না।

দোতলার এক কোণে কৃত্তিবাসের অফিস ঘর। অতি জরাজীর্ণ চেহারা। এক পাশে একটি টেবিল, সাত-আটখানি চেয়ার। এদিকে ওদিকে স্তূপীকৃত

কাগজপত্র। কড়িকাঠে ঝুল জমে আছে, পাখাটা বেশি জোরে ঘোরে না। অবশ্য এরই মধ্যে একটি বেশ শৌখিন বা গর্বের বস্তু আছে, একটি টেবল ল্যাম্প, যদিও তার আলো এক ফুটের বেশি দূর যায় না।

দিনের যে-কোনো সময়ে এলে এখানে দেখা যাবে বাচ্চা চেহারার তিনজন যুবককে, দেবাশিস বসু, সমরজিৎ সিংহ ও কার্তিক জানা—এরাই পত্রিকাটির মেরুদণ্ড। প্রায়ই দেখা যাবে আর একজন অতি মনোযোগী অথচ সুরসিক ব্যক্তিকে। যিনি ব্যাকরণে অত্যন্ত পারদর্শী, সেই রঞ্জনবাবুর ওপর আমাদের প্রুফের ভার। সন্ধের পর এখানে আসর একেবারে গুলজার। নিয়মিত এসে বসেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, এবং বরুণ চৌধুরী। এবং শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। ইদানীং দীপক মজুমদার। শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাবে যখন-তখন এসে কবিতার ফাইল খুলে নবীন কবিদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন। এছাড়া প্রায়ই আসে অতি উৎসাহী সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস দাস, প্রশান্ত রায় (ইদানীং শুধু শান্ত রায়)। সান্ধ্যকালীন আড্ডায় বা কাজে কখনো কখনো দেখা যায় সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, পার্থ মুখোপাধ্যায়, ভাস্বতী রায়চৌধুরী, হীরক রায়, পার্থসারথি চৌধুরী, বেলাল চৌধুরী, তপন ঘোষ, তন্ময় দত্ত ওরফে তরুণ দত্ত, মীনা চৌধুরী, পূর্ণেন্দু পত্রী, সমীর রায়চৌধুরী, স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়, আয়ান রশীদ, শান্তি লাহিড়ী, ব্রজকিশোর মণ্ডল, অমিতাভ দাশগুপ্ত···। কোনো কোনোদিন এসেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মৃণাল বসুচৌধুরী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। কদাচিৎ আসেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, মতি নন্দী, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বিপুল গুহ, আইভি রাহা, লাচ্চুদা, বরুণ বক্সী, রাণা ঘোষ এবং মধুর রহস্যময় কল্যাণ চৌধুরী। হঠাৎ হঠাৎ এসে হাজির হয়েছেন সমরেশ বসু। যাঁরা কখনো আসেননি, তাঁদের তালিকাও সুদীর্ঘ।

এখানকার আড্ডার উপকরণ, মুড়ি, তেলেভাজা ও কাঁচালঙ্কা। জানলা দিয়ে হাঁক দিলে নিচের চা-ওয়ালা চা দিয়ে যায়। কোনো কোনোদিন চেয়ার-গুলি সব ভর্তি হয়ে যাওয়ার পর অনেককে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এরই মধ্যে কোনো লেখিকা গ্রাহিকা বা সমভিব্যাহারিণী এলে সকলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। অবশ্য, অতিরিক্ত কাজের দিনে বাক্য-ব্যসন একেবারেই বন্ধ থাকে, সেসব দিনে আগন্তুকদের দু'কথায় বিদায় দেওয়া হয়। রমানাথবাবু স্বরাজবাবু পাঁচু বাবু বা অন্য প্রেসকর্মীরা আপ্রাণ খেটে আমাদের সাহায্য করেন, আমাদের

দেরি দেখলে নিজেরাই এসে তাড়া লাগান। আবার কোনো কোনোদিন আশানুরূপ কাজ হলে গণেশ দে মহাশয় উদার আহ্বান জানান। এসো, আনন্দ করা যাক্। সেই আনন্দোৎসব মধ্যরাত্রি পেরিয়ে যায়।

মাসিক হিসেবে কৃত্তিবাসের প্রকাশের তাৎপর্য কী, তা আমরা নবপর্যায় কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যাতেই বিস্তারিত ভাবে বলেছি। বাংলা সাহিত্যে এখন বিভিন্ন প্রকার গোষ্ঠী বা শ্রেণী আছে, আমরা চেয়েছিলাম, সেই বিভেদ সম্পূর্ণ ভেঙে দিতে। তাছাড়া সত্যিকারের নবীন লেখকদের একটি আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রও আমরা প্রস্তুত করতে চেয়েছিলাম। কৃত্তিবাস প্রায় কুড়ি বছর ধরে একটি খাঁটি কবিতার পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়ে খানিকটা ছাপ ফেলেছিল নিশ্চিত। সেই পত্রিকা যখন গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদিকে সঙ্গে নিয়ে একটি সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তখন অনেক কবিতা-প্রেমিকই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কয়েকমাসের মধ্যেই আমরা পাঠকদের চিঠিপত্রে সেই ক্ষুব্ধতার সুরের বদলে অন্য সুর লক্ষ করেছি। পুরো একবছরে আগের তুলনায় কৃত্তিবাসের কবিতার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে আমরা গল্পকার ও প্রাবন্ধিকদেরও বন্ধু হিসেবে পেয়েছি। ডাকে-আসা যে-কোনো লেখার বিচারের ক্ষেত্রেই আমরা লেখকের কৌলীন্যের কথা চিন্তা করিনি। এবং এই একবছরের প্রতি মাসেই আমাদের পত্রিকার একটি করে সংখ্যা বেরিয়েছে, এটাও কম কথা নয়।

আমাদের ব্যর্থতাও অনেকখানি। আমরা পত্রিকাটিকে যত উঁচু মানের আশা করেছিলাম, তা হয়নি। অসাধারণ, ইতিহাসসৃষ্টিকারী কোনো লেখা আমরা এখনো প্রকাশ করতে পারিনি। সর্বক্ষেত্রে স্বাধীন মত প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক বাধা নানা প্রকার। এজন্য আমরা ভেতরে একটা গ্লানি বোধ করি। কখনো কখনো আমাদের এমনই মনোবেদনার কারণ ঘটেছে যে মনে হয়েছে, আগামী মাস থেকেই পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হোক। নিছক মায়াবশত তা করা হয়নি। তবে একথা নিশ্চিত বলা যায় যে, পরীক্ষামূলকভাবে একবছর আগে এই নবপর্যায়ের কৃত্তিবাসের জন্ম, সেই পরীক্ষার প্রয়াস এখনো সমান রয়েছে। এই পত্রিকার ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত। যদি একটি খাঁটি সাহিত্য পত্রিকা হয়ে উঠতে পারে, তবেই এ পত্রিকা বাঁচবে। নইলে এর মৃত্যু এর স্রষ্টাদের হাতেই নিয়তিনির্দিষ্ট। যদি এই পত্রিকা অদূর ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যায়, তবু আমাদের সান্ত্বনা এই, আমরা চেষ্টা করেছিলাম। আমরা একটি সৎ সাহিত্য মাসিককে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছি, শেষ পর্যন্ত যদি না-ও পারি তবু

চেষ্টা যে করেছিলাম সেটাই আমাদের শেষ কথা। নিছক পরনিন্দা বা পরচর্চায় কালাপহরণ না করে নিজেরাই একটা-কিছু গড়ে তোলার প্রয়াস অন্তত করেছি। সুতরাং, আশা করা যায়, আমরা কখনো ব্যর্থ হলেও অন্য কেউ এ-দায়িত্ব আবার গ্রহণ করবেন।

অকস্মাৎ নরেন্দ্রনাথ মিত্র আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। সন্ধেবেলাতেও যাঁকে কর্মরত দেখেছি, ভোরবেলা তাঁর চিরপ্রস্থানের খবর পেলাম।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন অত্যন্ত নম্র ও মৃদুভাষী। তাঁর গল্পগুলির চরিত্রও ঐ-রকম। কখনো চড়া গলায় কিছু বলেননি, বিরাট কোনো সৃষ্টির দাবিও তাঁর ছিল না।

কল্লোল বা শনিবারের চিঠির দলের পর যাঁরা গল্পকার হিসেবে এলেন, তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সবচেয়ে কম চমকপ্রদ, অথচ তাঁর রচনা পাঠকের মগজের মধ্যে অনেকখানি শিকড় চালিয়ে দেয়। অনধিকারিণী, রস, এক পো দুধ, দ্বি-চারিণী প্রভৃতি গল্প বাল্যকাল থেকেই আমাদের সঙ্গী হয়ে আছে। নরেন্দ্রনাথ কৃত্তিবাস সম্পর্কেও উৎসাহী ছিলেন খুব, লিখেছেন আমাদের প্রথম সংখ্যায়। তাঁর আকস্মিক বিদায়ে আমরা শোকসন্তপ্ত।

একবার একজন পাঞ্জাবি ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন, মশাই বাংলাও ভাগ হয়েছে, পাঞ্জাবও ভাগ হয়েছে, পশ্চিম বাংলাতেও রিফিউজি এসেছে, পূর্ব পাঞ্জাবেও রিফিউজি এসেছে, কিন্তু গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে একটাও পাঞ্জাবি ভিখিরি আমাকে দেখান তো! কোনো উত্তর দিতে পারিনি, নতমস্তকে তাঁর নিগূঢ় খোঁচা মেনে নিয়েছি। পঞ্চনদ-তীরবর্তী পুরুষরা রণদুর্মদ, পরিশ্রমী, স্বাবলম্বী এবং তাদের আত্মসম্মানবোধের সঙ্গে জীবিকাও জড়িত। তারা প্রকাশ্যে সগর্বে বস্তুতান্ত্রিক, নিছক হিন্দুসুলভ নিয়তিবাদের তোয়াক্কা করে না! শুধু ভিখিরি নয়, তাদের মধ্যে সন্ন্যাসী বা কবির সংখ্যাও খুবই সামান্য। হিন্দু বাঙালির মধ্যে আবার ঐ তিনটিরই সংখ্যাধিক্য।

যাই হোক, এখানে প্রসঙ্গ অন্য। অতি সম্প্রতি আমি জানলাম, ভারতবর্ষের অন্তত একটি জায়গায় বাঙালি উদ্বাস্তুরা আর নিজেদের উদ্বাস্তু বলে পরিচয় দেয় না, কেউ তাদের ঐ নামে অভিহিত করলে অপমানিত বোধ করে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে তাদের এখনকার পরিচয় সেটলার্স বা উপনিবেশকারী। এক-একটি পৃথক পৃথক দ্বীপে গড়ে উঠেছে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙালি উপনিবেশকারীদের গ্রাম, সচ্ছল ও পরিচ্ছন্ন, কোনো ব্যাপারেই তারা সরকারের মুখাপেক্ষী নয়! তাদের চাষের ক্ষেত সুজলা-সুফলা, কখনো কখনো তারা ফেরিতে চেপে পোর্ট-ব্লেয়ারে আসে ঘড়ি, রেডিও বা জামাকাপড় কিনতে। তাদের তকতকে ঝকঝকে কাঠের বাড়ির সামনের আঙিনায় আছে তুলসীমঞ্চ, মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে সন্ধ্যারতি দেয়, তারপর রান্নাঘরে শুয়োর বা হরিণের মাংস রাঁধতে যায়। কোনো ছেড়ে আসা গ্রামের জন্য দীর্ঘশ্বাস এখানে শোনা যায় না, এখন তাদের পায়ের তলার ভূমিই মাতৃভূমি। এই দৃশ্য দেখে বড়ো তৃপ্তি লাগে। চতুর্দিকের ব্যর্থতার মধ্যে কোথাও একটা সার্থকতার কাহিনী অকস্মাৎ বুক ভরিয়ে দেয়। গোটা আন্দামানে ভিখিরি আছে একজন মাত্র, পোর্টব্লেয়ারের একটি দোকানের সামনে বসে সে রোজ সন্ধেবেলা ভিক্ষের বদলে চাঁদা চায় এবং ঠিক দেড় টাকা উঠলেই সে লোভ সংবরণ করে কোথায় যেন উঠে চলে যায়।

সম্পাদক হিসেবে কিছু লিখতে বসলেই যেন খানিকটা ভারিক্কি হয়ে যেতে হয়। যেন পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যা সুরাহা করার দায় আমার কাঁধে, যেন এই সমাজ ও সংসার সম্পর্কে কিছু সুশৃঙ্খল কথা বলার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। ...অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম, শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আমাদের পত্রিকার পক্ষ থেকে কিছু বলা প্রয়োজন। কিন্তু মনস্থির করতে পারি না। ভেতরে একটা দ্বৈতসত্তার দোলাচল টের পাই! নিজে একজন লেখক হিসেবে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে খুব একটা উৎসাহ বোধ করিনি; এমনকি, একথাও কখনো মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, ধুস্! বস্তুত শরৎচন্দ্র বিষয়ে আলোচনায় আজকাল যে-সব বিষয় নিয়ে ঢাকঢোল পেটানো হয়, যেমন তিনি মানুষকে কতটা ভালোবাসতেন

কিংবা সমাজের কতসব অন্যায় তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন কিংবা গ্রাম-বাংলার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন—এর কিছুই সাহিত্যের বস্তু নয়। অন্তত সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ভিন্ন। তাছাড়া শরৎচন্দ্রের রচনার অন্তত আশি ভাগই নিছক রোমান্টিক প্রেমের গল্প, প্রবন্ধকাররা তাঁকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন অন্য প্রকার।

আবার সম্পাদক হিসেবে, খানিকটা দায়িত্ববান হতে গিয়ে, মনে হয়, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এই যে দেশব্যাপী উচ্ছ্বাস, এরও মূল্য আছে। অসংখ্য পাঠকের মন তিনি স্পর্শ করেছিলেন, সম্ভবত এখনো করে যাচ্ছেন। শুধু জনপ্রিয় কাহিনীকার হিসেবেই নয়, নিজেদের বন্ধুর মতনই। তাছাড়া, যেমন দেবদাস, উপন্যাস হিসেবে নিশ্চিত প্রথম শ্রেণীর নয়, কিন্তু বাঙালি জীবনের একটা সামগ্রী হয়ে গেছে। কোনো পরিবারেই আজকাল সচরাচর ছেলের নাম দেবদাস রাখা হয় না, সম্ভবত এই কারণে। শরৎচন্দ্র, এখনো আমাদের কাছে, নিজ পরিবারের এক বাউণ্ডুলে বেহিসেবি ছোড়দার মতন, যাকে ভালো না-বেসে পারা যায় না, যার প্রতি দুর্নিবার টান অনুভব করি, কিন্তু বিশ্বের সামনে যাকে নিশ্চিত একজন আদর্শ পুরুষ হিসেবে তুলে ধরতে যাব না।

পূর্ববঙ্গের ইস্কুলে-পড়া নিরঞ্জন মজুমদার ছিলেন পাকা সাহেব, ইংরেজিতে ছাড়া কথা বলতেন না, কিন্তু বাংলাভাষা সম্পর্কে যাঁর টান ছিল অতি আন্তরিক। "শীতে উপেক্ষিতার" লেখক রঞ্জন বাংলা সাহিত্যে খানিকটা উপেক্ষিত রয়ে গেলেন, কিন্তু মানুষটিকে আমরা বহুদিন মনে রাখব। তিনি ছিলেন বহু বিষয়ে জ্ঞানী, সজাগ, সুরসিক মানুষ, তাঁর আপাত-অহংকারী ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিল একটি অত্যন্ত কোমল স্পর্শকাতর মন, আমরা সেটা জেনে গিয়েছিলাম।

দুটি তরুণও অকালে চলে গেল। উমাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল একটি পাগলাটে তরুণ, 'বাংলাদেশ' স্বাধীন হবার পরই 'গুলিবিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ' নামে কবিতার বই বার করে, এছাড়াও কবিতার জন্য সে ছিল অক্লান্ত উদ্যমী, হঠাৎ মরে গেল দুম করে। বিশ্বরঞ্জন দে, শিল্পী, থাকত দুর্গাপুরে, বড়ো লাজুক ও মনোরম যুবা, হঠাৎ সেদিন একটা বাস দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল। উচিত হয়নি, ওদের মরে যাওয়া একদম উচিত হয়নি!

বাংলাদেশ থেকেও সিকান্দার আবু জাফর এবং আবুল হাসান নামের দু'জন কবির অকালমৃত্যুর সংবাদ পেলাম। মন খারাপ লাগে।

আজকাল আমাদের অনেক সময় মনেই থাকে না যে কলকাতা থেকে মাত্র সত্তর-আশি মাইল দূরে বাংলাদেশ নামে নতুন একটি রাষ্ট্র আছে। হঠাৎ কখনো পশ্চিমবাংলার বদলে বাংলাদেশ বলে ফেলে, আমরা আবার সংশোধন করে নিই, ডান হাতের আঙুল তুলে বলি, ঐ বাংলাদেশ নয়। অথচ, মাত্র পাঁচ বছর আগে, এই জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে কী বিপুল উদ্দীপনা ছিল বাংলাদেশের নামে। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা নিজেদের ভাষা এবং জাতীয়তাবোধের সম্মানে নিজেদের অংশকে স্বাধীন করেছে, এর জন্য ছিল আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি। সেই সময় কলকাতার অনেক বাড়িতেই ঢাকার মুসলমান যুবকরা আতিথ্য নিয়েছিল, তখন আমাদের মনে হতো, ওরা আর আমরা একেবারেই সমান, পাকিস্তানি আমলে একটা কৃত্রিম ব্যবস্থায় আমাদের মধ্যে বিভেদ ঘটিয়ে রাখা হয়েছিল। ঢাকায় ২১ ফেব্রুয়ারির বিরাট স্মরণোৎসবে আমরা অনেকেই যোগ দিতে গেছি, সাদর আতিথ্য পেয়েছি অনেকের কাছ থেকে, তখনও মনে হয়েছে, ওরা এবং আমরা এক। আমরা ভেবেছিলাম, আর কোনো নিষেধের প্রাচীর থাকবে না, যাতায়াত সুগম হবে, সাংস্কৃতিক বিনিময় অব্যাহত থাকবে।

হায়, মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে কত কী বদলে গেল। এখন দূরত্ব যেন আগের চেয়েও অনেক বেশি। তার চেয়ে বড়ো কথা, আগে যে আগ্রহ বা ব্যাকুলতা ছিল, তা-ও এখন নিঃশেষ হয়ে গেছে। শুনেছি, এপারে দেয়ালের লিখনে বা লোকের মুখে মুখে ভারত-বিরোধী প্রচার রমরম্ করছে। তার উত্তর এদিক থেকে দেওয়া হচ্ছে ঠাণ্ডা ঔদাসীন্যে। এদিকে বাংলাদেশের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো প্রচারই নেই; দু-একটা লঞ্চ ডুবি কিংবা প্রশাসকদের দফতর বদল ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো সংবাদই এখানে ছাপা হয় না। অপরপক্ষে, বাংলাদেশের বেতার শুনে দেখেছি, তাতে মনে হয়, তাদের কাছে যেন কলকাতা বা ভারতের কোনো অস্তিত্বই নেই। করাচীতে বাস উল্টে কতজন লোক হতাহত হয়েছে, সে-খবর শোনা যায়, শোনা যায় না চাসনালায় বিরাট খনি-দুর্ঘটনার কথা। এই দূরত্ব আরো কত বাড়বে?

রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলের সঙ্গে সঙ্গে অসহায়ভাবে অনেক জাতির ভাগ্য বদলে যায়। তবু সাধারণ মানুষের ওপর আমরা ভরসা হারাতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস দু'-দেশেরই সাধারণ মানুষ পারস্পরিক মিলনের জন্য উদগ্রীব।

দেশের আভ্যন্তরীণ দুর্দশা চাপা দেবার জন্য অনেক সময় সাধারণ মানুষের সামনে একটা জুজু খাড়া করানো হয়। বাংলাদেশে ভারত-বিরোধী প্রচারের উদ্দেশ্য বোধহয় তাই। এদিক থেকে আমরা এইটুকু শুধু জানাতে চাই, বাংলাদেশকে শোষণ করার কোনো মনোবৃত্তি সাধারণ স্তরে বা সরকারি মহলে একটুও দেখিনি এ-পর্যন্ত। যাদের সঙ্গেই কথা বলেছি, সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাবই দেখেছি। বাংলাদেশে ধর্মের জিগির নতুন করে উঠলেও, তার উত্তরে ভারতে সাম্প্রদায়িকতা প্রকট হয়ে ওঠেনি। মহারাষ্ট্রে পঞ্চাশ হাজার মানুষের এক মিছিলে শিখ ও হিন্দুরা ধ্বনি তুলেছে 'নারায়ে তকৃদির···আল্লা হো আকবর', মুসলমান ও হিন্দুরা ধ্বনি তুলেছে 'বোলে সো নিহাল··সৎশ্রী আকাল' এবং শিখ ও মুসলমানেরা ধ্বনি তুলেছে 'হর হর মহাদেব'। এটা শুধু নিছক একটা চমকপ্রদ ঘটনা নয়। কিংবা তা হলেও এর মূল্য আছে, কারণ মহারাষ্ট্রে এরকম কখনো ঘটেনি আগে।

আরও একটা কথা। চোরাচালানি কিংবা দুর্বৃত্তরা সীমান্ত দিয়ে কতখানি পাট নিয়ে আসে, সে খবর আমরা সত্যিই জানি না—কিন্তু একথা জোর দিয়েই বলতে পারি, বাংলাদেশের চাল কিংবা মাছ এখনো কলকাতার রান্নাঘর ধন্য করে না।

বন্ধুর আর এক নাম অত্যাসগহন। অর্থাৎ যার ত্যাগ সহ্য করা যায় না। বাংলাদেশের বন্ধুদের আমরা সেই অর্থেই গ্রহণ করেছিলাম।

অকস্মাৎ ভোরবেলা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর মৃত্যুসংবাদ পেলাম। বাংলা সাহিত্যের এককালের দুর্ধর্ষ নায়ক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মঞ্চ থেকে চলে গেলেন। তাঁর আরও কিছু কাজ অসমাপ্ত থেকে গেলেও তিনি অনেকখানি দিয়ে গেছেন আমাদের।

ভাবতে অবাক লাগে, একই স্কুলের একই ক্লাসের দুই বন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বাংলা সাহিত্যকে তোলপাড় করে দিতে এসেছিলেন। পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন বুদ্ধদেব বসু। অচিন্ত্য-প্রেমেন-বুদ্ধদেব, কল্লোল যুগের এই প্রধান ত্রয়ীকে আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখেছি। 'বেদে' উপন্যাসে অচিন্ত্য-কুমারের যাত্রা শুরু। শহুরে, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারই ছিল তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু, "দুইবার রাজা", "অরণ্যের" মতো গল্প, 'কাক জ্যোৎস্না' বা 'প্রথম প্রেমে'র মতন উপন্যাস সেই সময়কার। তাঁর দুটি উপন্যাস, 'প্রাচীর ও প্রান্তর' এবং 'বিবাহের চেয়ে বড়' শ্লীলতার বিচারে একসময় সাংঘাতিক বাধা পেয়েছিল। তারপর থেকে, তাঁর জীবনযাত্রা বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাহিনীর পটভূমিও বদলায়,

মুনসেফের কাজ নিয়ে মফঃস্বলে ফেরার সময় গ্রাম বাংলার মানুষ জীবন্ত হয়ে ওঠে তাঁর কলমে। "সারেং", "বাঁশবাজি"র মতন আশ্চর্য গল্প এবং 'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী'র মতন মধুর উপন্যাস লিখেছেন সেই সময়। বিশেষত, নিম্নবিত্ত মুসলমান সমাজ নিয়ে এমন সার্থক রচনা তাঁর আগে বিশেষ কেউ লেখেননি।

কল্লোল যুগে অচিন্ত্যকুমার কবি হিসেবেও সমধিক পরিচিত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি, তাঁর অপর দুই বন্ধুর তুলনায় তাঁর কবিতা খানিকটা বাকসর্বস্ব। 'কল্লোল যুগ' বইতে তিনি তাঁদের যৌবনকালের চমৎকার ছবি এঁকেছেন।

জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে অচিন্ত্যকুমার ধর্ম ও ভক্তি সাহিত্যের দিকে ঝোঁকেন। তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী' তাঁকে প্রভূত জনপ্রিয়তা দিলেও তাঁর প্রতি যুব সম্প্রদায়ের আগ্রহ কমতে থাকে। একেবারে শেষের দিকে তরুণতরদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল খুবই কম। তবু আমরা শুনেছি, সাহিত্য রচনাকে তিনি ধর্মের মতন গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিদিন, পূজা-অর্চনার মতনই, তিনি লিখতে বসতেন। তাঁর এই সাধনা আমাদের ধন্য করেছে।

সত্যজিৎ রায়ের যে-কোনো নতুন চলচ্চিত্রের প্রকাশই আমাদের সংস্কৃতি-জগতের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁর সদ্যমুক্ত ছবি 'জন-অরণ্য' আরও তুমুলতর আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। তাঁর আর কোনো সৃষ্টি সম্পর্কেই এমন সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর এবং উচ্চগ্রামের মন্তব্য শোনা যায়নি। সার্থক শিল্প কখনো মানুষকে নিশ্চিন্ত করে না।

'জন-অরণ্য' ছবিতে সত্যজিৎ রায় বাস্তবের সত্যের সঙ্গে কোনো রকম আপস করেননি। এর আগেও যে তিনি কখনো আপস করেছেন এমন নয়, কিন্তু আগে তিনি নিছক আজকালকার ঘটনার ওপরেই গুরুত্ব দেননি। পটভূমিকার চেয়েও একজন মানুষের ব্যক্তিগত ট্রাজেডিকে তিনি বেশি করে তুলে ধরতেন, সেখানে তিনি ভাষ্যকার। নতুন ছবিতে তিনি দ্রষ্টা, সেইজন্যই তাঁকে অসম্ভব নির্লিপ্ত হতে হয়েছে, এখানে বেছে নেওয়া বা বর্জনের প্রশ্ন নেই। এ ছবির নায়ক

বিশেষ কেউ নয়, ভিড়ের মধ্য থেকে টপ করে তুলে নেওয়া যে-কোনো একজন। সেইজন্যই, প্রথমদিকে, পরীক্ষার বেঞ্চে কিংবা চাকরি খোঁজার সময়, অনেকগুলি মুখের মধ্যে সোমনাথের মুখ। এরপর সোমনাথ যখন আলাদা হয়ে যায়, তখনকার দৃশ্যগুলি দেখতে দেখতে আমাদের মনে হয় যে, এইসবই আমাদের জানা, হ্যাঁ, এরকমই ঘটে থাকে, সোমনাথ এইদিকেই যেতে বাধ্য হবে। সেই সঙ্গে এই উপলব্ধিও হয়, সাম্প্রতিক কালকে এমন নির্মোহভাবে দেখাবার মতন সাহসী মানুষও আমাদের দেশে আছেন এবং কত বড়ো শিল্পী হলে এই জানা, অতি চেনা দৃশ্যাবলীও মহৎ শিল্পে উন্নীত করতে পারেন।

মানুষের পতনকাহিনীর সবচেয়ে করুণ দিক এই যে এক সময় সে অন্যায়কে অন্যায় বলে চিনতে পেরেও মেনে নেয়। তার সমস্ত প্রশ্ন তখন মিশে যায় ঐ মেনে নেওয়ার মধ্যে। সমকাল অনেক কিছুই এভাবে মেনে নিচ্ছে। অনেকে এই ছবিকে নৈরাশ্যের ছবি বলছেন। এতে কোনো আশাবাদ নেই, কিংবা গরম গরম প্রতিবাদের বাণীও নেই। কিন্তু সেসব হতো নিতান্তই আরোপিত এবং সার-সত্যের ওপর আরোপিত কিছুই শিল্প হয় না। পরাজিত মানুষকে নিয়েও মহৎ শিল্প হয়—কারণ তাতে বোঝা যায়, শিল্পী এখনো পরাজিত হননি, তিনি এখনো অন্যায়কে অন্যায় বলে চিনিয়ে দিচ্ছেন। এবং এই শিল্পের যারা দর্শক, তারাও তাদের ভেতরের অন্যায়টা চিনতে পেরে বাইরে নিয়ে আসতে পারে। সেই কারণেই 'জন-অরণ্য' একটি অসাধারণ সৃষ্টি এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রের গর্ব।

ইদানীং আমরা কিছু ব্যাকুল চিঠিপত্র পেতে শুরু করেছি, যাতে এইরকম কথা থাকে, 'আজকাল নিয়মিত পত্রিকা পাচ্ছি না, গত মাসেরটা এখনো পাইনি। ভয় হয়, এ পত্রিকা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে না তো?' ভয় আমাদেরও হয়। বন্ধ হবার জন্য নয়, অন্য কিছুর

এও কি সম্ভব, কৃত্তিবাস নিয়মিত বেরুচ্ছে, সুশৃঙ্খলভাবে, আমাদেরই উদ্যোগে, আমরা যারা জীবনে কোনো কাজই ঠিক নিয়মশৃঙ্খলা মেনে করতে পারিনি। সত্যি বড়ো ভয় পাবারই কথা। এখন যে কৃত্তিবাস আবার একটু অনিয়মিত হতে পেরেছে, আমাদেরই উদ্যোগে, এতেই বরং আমরা এখন একটু স্বস্তি বোধ করছি।

"বন্ধ হয়ে গেলে কিন্তু খুব দুঃখ পাবো"—ব্যাকুল চিঠিপত্রে এরকম লাইনও থাকে। কেউ কিছু প্রত্যাশা করলে তা পূরণ করার একটা দায়িত্ব এসে যায়। এত বড়ো দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা আমাদের কোথায়? জন্মকাল থেকেই কৃত্তিবাসের একটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাব আছে। কারুর দায়িত্বে নয়, এ কাগজ আপনা-আপনিই বেরোয়, ঝড়ে উড়ে আসা পাতার মতন লেখাপত্তরও আপনা-আপনি এসে যায়। এ কাগজ কেন আরো ভালো হচ্ছে না বলে যাঁরা রাগারাগি করেন, তাঁদের জানিয়ে রাখি, এ কাগজ যে-রকম ঠিক সেই রকমই চলবে. এর চেয়ে ভালো কিংবা খারাপ হবার কোনো ক্ষমতাই এর নেই। কোনো কোনো শুভার্থী পরামর্শ দেন, "কাগজটাকে আরো বড় করে তুলছো না কেন?" কাগজ আরো বড়ো হবে, প্রচার সংখ্যা বাড়বে, দলে দলে লোকজন আসবে, লোহার গেট, টেলিফোন, নিউজ-প্রিন্টের থান, হকারের ভিড়··· সেই দৃশ্য ভাবলেও গায়ে জ্বর আসে! নিজেরাই একটা দৈত্য গড়ে তুলবো. যে দৈত্য শেষে একদিন আমাদের গলা টিপে ধরবে? জীবনে সত্যিকারের উপভোগ করার মতন একটাই জিনিশ আছে, যার নাম সময়. সেই সময় আমরা সবটা দিয়ে দেবো একটা কাগজকে, যা নাকি পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করবে?

না, এ হবে না। যেমন চলছে চলুক। কৃত্তিবাস এইরকম ভাবেই চলবে। নতুন পর্যায়ে প্রকাশের সময় ঘোষণা করা হয়েছিল, এ কাগজ প্রাণ খুলে লেখার জন্য। এখন প্রাণ খুলে লেখবার দিন আর নেই। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে, এমন কোনো তীব্র শক্তিশালী যুক্তিসিদ্ধ রচনা আমরা এ পর্যন্ত পাইনি, যা আমাদের পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশের ব্যাপারে কোনো বাধা দেখা দিয়েছে। কৃত্তিবাস আদি ও অকৃত্রিমভাবে একটি সাহিত্য পত্রিকা, দল-মত-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল সাহিত্য রচনাকারের জন্যই এর পৃষ্ঠাগুলি অপেক্ষা করে আছে।

কৃত্তিবাসের আগামী সংখ্যাটি কবিতা সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রবীণ থেকে অতি তরুণ কবিদের পর্যন্ত শান্ত. বিপন্ন, রাগী এবং তুলকালাম কবিতায় সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হবে।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের দ্বিশততম জন্মদিনে আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় কিছু উৎসব ও বক্তৃতাদি হয়েছিল। ঐ মনীষীর স্মৃতিযাপন সেখানেই থেমে থাকেনি। জন্ম নিয়েছে রামমোহন ফাউণ্ডেশান নামে একটি প্রতিষ্ঠান। ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান হয়েছেন প্রখ্যাত গবেষক ও লেখক ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। ঐ প্রতিষ্ঠানের সঠিক কাজ কী, তা আমরা জানি না। আমরা এদেশের শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, বিদেশেরও অনেক রকম খবর রাখি, কিন্তু এই সব প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে যখন জানি না, তখন ধরে নেওয়া যায়, ঐ সম্পর্কে আমাদের জানবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়নি।

সম্প্রতি কোনো কোনো গ্রন্থাগারের পরিচালকদের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে রামমোহন ফাউণ্ডেশান দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে নানা সময়ে কিছু বই-পত্র দান করে থাকেন। এটা তো একটা চমৎকার প্রচেষ্টা হবার কথা। আমাদের দেশের বহু গ্রন্থাগারেরই এখন রুগ্‌ণ দশা, কাগজের দাম বাড়ার জন্য বইপত্রেরও দাম খুব বেড়েছে, সুতরাং শুধু সভ্য-চাঁদায় নিয়মিত নতুন বই কিনে একটি গ্রন্থাগার চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে অবশ্য কিছু সরকারি সাহায্য পাওয়া যায়, তাই রক্ষা। এই পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন ফাউণ্ডেশানের সাহায্য আরো স্বাগতম। আমরা এই উদ্যোগকে অজস্র সাধুবাদ জানাতে উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু কয়েকটি তথ্য জেনে স্তম্ভিত হলাম।

রামমোহন ফাউণ্ডেশান কোনো গ্রন্থাগারকে সরাসরি টাকা সাহায্য দেন না, বই দান করেন। অর্থাৎ বই নির্বাচনের কোনো সুযোগ গ্রন্থাগারের নেই। কয়েকজন গ্রন্থাগারিক রামমোহন ফাউণ্ডেশানের দান করা কিছু বইয়ের নমুনা আমাদের দেখালেন। দেখে বিষাদে মন ভরে যায়। বই দু'রকম হতে পারে, ভালো বই বা অকিঞ্চিৎকর বই। রামমোহন ফাউণ্ডেশানের নির্বাচনে শুধু কুরুচির চিহ্নই নেই, আছে তস্করতার প্রকট চিহ্ন। বোঝা যায় কিছু ছিঁচকে পুস্তক ব্যবসায়ী এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের কিছু কর্মীর যোগসাজশে একটা কুৎসিত কাণ্ড চলছে। অনেকগুলি সামান্য চটি চটি পুস্তিকা, যাদের পৃষ্ঠাসংখ্যা দশ কিংবা বারো--সেগুলির দাম বাইশ বা চব্বিশ টাকা। পুস্তিকাগুলি 'পথ চলার নিয়ম' বা 'আমাদের কৃষি'—এই ধরনের। এর কোনো বইয়ের দাম এক টাকা বা দু' টাকার বেশি হতে পারে না। মতি নন্দীর একটি নির্বাচিত গল্প সংগ্রহের

বাজারে দাম দু' টাকা মাত্র, এখানে দেখানো হয়েছে ষোলো টাকা! এবং এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে কিছু অতি শস্তা হিন্দী পেপারব্যাক। বাংলা গ্রন্থাগারে হিন্দী বই! আমরা নিশ্চিত যে শ্রদ্ধেয় ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় এ সম্পর্কে কিছু জানেন না—কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানের তিনি কর্তা, সেখানে এমন ব্যভিচার চলছে বলে আমরা নিজেরাই লজ্জাবোধ করছি! আমাদের আরও লজ্জা এইজন্য যে অন্যান্য অনেক ব্যাপারে আমরা দুর্নীতি প্রত্যক্ষ করি বা অভিযোগ শুনি, কিন্তু বইপত্রের ব্যাপারে যাঁরা জড়িত তাঁদের মধ্যেও এত অপরিচ্ছন্নতা!

কৃত্তিবাসের এই সংখ্যাটি কবিতা সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হলো। এক সময় এই পত্রিকা ছিল শুধু কবিতার, ইদানীংকার রূপান্তরে কেউ কেউ দুঃখ বোধ করেছেন. তাই আমরা মাঝে মাঝে এরকম এক একটি সংখ্যা শুধু কবিতা দিয়ে সাজিয়ে প্রকাশ করার ইচ্ছে রাখি। এই সংখ্যাটি আমরা যতদূর সম্ভব সুসমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছি, যদিও সকলের কবিতা শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। একটু তাড়া-হুড়োর জন্য কবিতাগুলির সংস্থাপন খুবই এলোমেলো হয়ে গেছে। বয়েস বা নামের বর্ণানুক্রম—কোনোটাই রক্ষা করা যায়নি, এজন্য সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। তবে প্রবীণ বা খ্যাতিমানের পাশেই অতি তরুণের স্থান হওয়ায় বৈচিত্র্যের স্বাদ এসেছে। যাঁরা মনোযোগী তাঁরা প্রতিটি পৃষ্ঠাই যে খুঁটিয়ে পড়বেন, সে সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

এই কবিতা সংখ্যাটি সম্পাদনা করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

কিছুদিনের জন্য কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে, সন্ধেবেলা, বাড়ি পৌঁছোবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই খবর পেলাম, শংকর আর নেই। গৌহাটিতে সে গিয়েছিল অফিসের কোনো কাজে, সেখান থেকে সে আর ফিরবে না!

টেলিফোনে প্রথম খবর শুনেই আমার যে অনুভূতি হয়, তার নাম শোক বা দুঃখ নয়। বন্ধুর জন্য কীভাবে শোক করতে হয়, সে সম্পর্কে আমার এখনো

কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি। প্রথম কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার সময় আমার মনের যা অবস্থা হয়, সে অনুভূতির আমি নাম জানি না। তা আঘাত ও বিস্ময়ের সমন্বয়ে একটা কিছু। তারপর হঠাৎ আসে রাগ। আমি সামনের কাঠের বস্তুটার ওপর একটা ঘা মেরে চেঁচিয়ে বললাম, গড ড্যাম্ ইট! কেন, কেন শংকর? হ্যাঁ, ঠিক এই রকমই আধা ইংরিজি মিশিয়ে কথাটা আমি বলেছিলাম, ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে একা।

আর যারই হোক, এত নিকট মৃত্যু শংকরের প্রাপ্য ছিল না। বেঁচে থাকার জন্য ওর একটা মমতাময় ভালোবাসা ছিল। শুধু একা নয়, আর সবাইকে নিয়ে, অনেকদিন ধরে বেশ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা। ওর ছিল ভবিষ্যতে বিশ্বাস। আজ যা ঠিক নেই, ভবিষ্যতে তা সব ঠিক হয়ে যাবে, এমন আশা ছিল শংকরের। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ অনেক বিপজ্জনক খেলা খেলেছে। যেমন শক্তি, শরৎকুমার, সন্দীপন বা উৎপল বা দীপক—জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানের সূক্ষ্ম তার দিয়ে অনেকবার হেঁটে গেছে স্বেচ্ছায়; এমন-কি পাঁচ দশ বছর আগেই হঠাৎ যে-কোনোদিন আমার পক্ষেও দুম করে মরে যাওয়া বিচিত্র কিছু ছিল না। কিন্তু শংকর তো সেরকম ঝুঁকি নেয়নি কখনো। আমাদের এককালের আকস্মিক নিরুদ্দেশ যাত্রায় শংকর স্টেশনে গিয়ে আমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছে বহুবার, নিজে যায়নি। আমরা পারিবারিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি অনেকদিন, মা-বাবা ভাই-বোনদের কাছ থেকে দূরে সরে এসেছি কিন্তু শংকরের জীবন ছিল সকলকে নিয়ে। সে তার মা, বোন, ভাই বন্ধুদের নিয়ে একটা সম্পূর্ণ জগৎ গড়ে তুলেছিল—সকলকে নিয়ে চেয়েছিল সে উপভোগের সুখ। এমনভাবে হঠাৎ সকলকে ছেড়ে একা চলে যাবার মতন নিষ্ঠুর কাজ তো সে কখনো করেনি সারা জীবনে! তাই ঘটনাটা কিছুতেই সত্যি বলে মনে হয় না। মনে হয় যেন কারুর ষড়যন্ত্র। টেবিলে আবার মুষ্ট্যাঘাত করে বলতে ইচ্ছে হয়, গড ড্যাম ইট! কেন, কেন শংকর—

খবরটা শোনার পর বেশ কিছুক্ষণ দিশেহারা হয়ে থাকি। শংকরের মা, ভাই, বোন, অন্য বন্ধুবান্ধব,—কারুর সামনেই দাঁড়াতে ভয় করে, ইচ্ছে করে পালিয়ে যেতে।

সাহিত্যের সংসারে প্রবেশের গোড়ার দিকে কলকাতায় প্রথম যে-কয়েকজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, শংকর তাদের একজন। শংকর সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান—তার দরাজ গলা ও উচ্চহাস্য নিয়ে সে সবসময় আমাদের মধ্যে থেকেছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে। ওদের ল্যান্সডাউন রোডের একতলা ঘরে আমরা বেশ-কিছু বছর ধরে প্রতি

রবিবার আড্ডা জমিয়েছি—সেখানে অনেকে তাদের রচনা পড়ে শুনিয়েছে এবং শংকরের প্রখর দৃষ্টিকে কারুর ফাঁকি দেওয়ার উপায় ছিল না—দু'-তিন সপ্তাহ কোনো নতুন লেখা যে শোনাননি, শংকর তাকে উত্ত্যক্ত করে মারতো, তাকে লিখতেই হতো। শংকরের প্ররোচনায় বা তাড়নায় অনেকেই, আমি নিজে তো বটেই, অনেকগুলি নতুন লেখা লিখতে বাধ্য হয়েছে।

সাহিত্য ব্যাপারটা শংকরকে ওর সমস্ত জাগ্রত সময়টুকুতেই ব্যাহত করে রাখতো। এইজন্যই শুধু নিজের লেখাই নয়, চেনা-অচেনা সকলের লেখার প্রতি ছিল তার সমান আগ্রহ। কোনো বন্ধুর ভালো লেখা পড়ে তৎক্ষণাৎ তাকে জানাবার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করা বুঝি একমাত্র শংকরেরই ছিল। এখন আমরা অনেক বন্ধুরাই খানিকটা দূরে সরে গেছি—নিজেদের রচনার ভালোমন্দ সম্পর্কে মন্তব্য করার প্রথা উঠেই গেছে প্রায়—তবু এর মধ্যে শংকরই ছিল একমাত্র যোগসূত্র, প্রত্যেকের খুঁটিনাটি লেখার দিকে তার ছিল প্রখর মনোযোগ এবং ভালো বা মন্দ যাই লাগুক, তা স্পষ্ট গলায় জানিয়ে দেবার ব্যাপারে তার কোনো দ্বিধা ছিল না।

শুধু বন্ধু বা সমসাময়িকদের প্রতিই নয়, পরবর্তীকালের নবীন লেখকদের রচনা সম্পর্কেও শংকরের ছিল সঠিক উৎসাহ। শংকরের আছে যে-কোনো লেখকেরই একমাত্র যোগ্যতার মানদণ্ড ছিল ভালো লেখা। যে ভালো লিখবে, সে-ই শংকরের বন্ধু।

কৃত্তিবাসের সঙ্গে শংকরের যোগ ছিল একেবারে গোড়ার সময় থেকে। আমরা অনেকেই তখন ছিলাম উত্তর কলকাতা-নিবাসী। সুদূর-দক্ষিণ কলকাতা থেকে শ্যামল-তারাপদ-শংকর প্রায়ই যেত উত্তরে কৃত্তিবাসের আড্ডায় যোগ দিতে। এটা শ্যামল-তারাপদর পক্ষে আশ্চর্য কিছু নয়, কিন্তু শংকরের পক্ষে ছিল রীতিমতন দীর্ঘ ভ্রমণ। নানা জায়গায় ছোটাছুটি ওর পছন্দ ছিল না। নিজের বাড়ির চেয়ার টেবিল, নিজের বিছানার বালিশ, বাড়ির কাছাকাছি চায়ের দোকান ও ফুটপাথই ছিল ওর প্রিয় জায়গা। একবার শান্তিনিকেতন ও নিজের ভাইয়ের কাছে কয়েকবার দুর্গাপুর ছাড়া শংকর আর কোথাও কখনো গেছে বলে শুনিনি, এই নিয়ে আমরা ঠাট্টাও কম করিনি। শংকরের বন্ধুপ্রীতি প্রায় বাৎসল্যের মতন তীব্র ছিল বলেই আমরা অনেক সময় ওকে টেক্‌ন ফর গ্রান্টেড হিসেবে নিয়েছি, ওকে খুঁচিয়েছি। বকেছি, কারণ জানতাম শংকর কখনো রাগ করে চলে যাবে না। ও থাকবে। ইদানীং কয়েক মাস অফিসের কাজে শংকরকে বাইরে যেতে

হচ্ছিল। হঠাৎ সে অনেক, অনেক দূরে চলে গেল।

চাকরি-বাকরি বা অন্যান্য জাগতিক ব্যাপারে শংকরের লোভ বা আগ্রহ কখনোই তেমন ছিল না। ওর সমস্ত স্বপ্নই ছিল সাহিত্য নিয়ে। কবিতা ও গল্প—দুদিকেই ওর সমান যাতায়াত ছিল, কিন্তু বেশি টান ছিল কবিতারই দিকে। লিখতে শুরু করার অল্প দিনের মধ্যেই শংকর ছোটগল্প লেখক হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেছিল—এখনকার লেখকের মধ্যে তার নাম ছিল প্রথম সারিতে। গদ্যের দিকে যারা একবার যায়, তারা সাধারণত আর কবিতার কথা মনে রাখে না, কিন্তু শংকর গদ্য রচনায় সাফল্য ছুঁয়েও হঠাৎ আবার বেশি করে ফিরে আসে কবিতায়, এবং কবিতার মধ্যে নিজেকে অনবরত বদলাতে থাকে। তার ইদানীং-কার কবিতাগুলি গাঢ় উপলব্ধিতে নিটোল।

কৃত্তিবাসের যখন এই দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়, অনিয়মিত কবিতা পত্রিকার বদলে বেরুতে শুরু করে পূর্ণাঙ্গ মাসিকপত্র হিসেবে—সেই সময় আমি শংকরকে বলেছিলাম, তুই মাঝে মাঝে সন্ধের দিকে কৃত্তিবাস অফিসে এসে কাজকর্ম একটু দেখেটেখে দিবি কিন্তু। এখন আমরা সকলেই নানা কাজে ব্যস্ত, কারোর একার পক্ষে এত বড় কাগজ চালানো শক্ত, তাই প্রত্যেকেরই কিছু কিছু শ্রমদান প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শংকর একদিনও কৃত্তিবাস দপ্তরে আসেনি। এতে আমি খানিকটা বিস্মিত ও অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম।

এরপর দেখা হলে আমি কখনো কখনো ওর প্রতি কঠোর ব্যবহার করেছি। শংকর কোনো উত্তর দেয়নি, একটুকাল চুপ করে থেকে. ওর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হেসে বলেছে, রাগ করিস না, আমার ওপর রাগ করে বেশিদিন থাকতে পারবি না! তখন বুঝতে পারিনি। পরে বুঝেছি যে, আরও কয়েকজনের মতন, শংকরও কৃত্তি-বাসের এই রূপান্তর ঠিক মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। সেই কৃশ, অনিয়মিত কবিতা-কৃত্তিবাসই ছিল ওর প্রিয়, তার বদলে এই বড়ো-সড়ো চেহারার পাঁচ-মিশেলি পত্রিকা যেন অনেক অচেনা। আসলে আমার নিজেরই তো এক এক সময় মনে হয়, আমাদের যৌবনের সঙ্গী সেই কৃত্তিবাসকে এতদূর টেনে নিয়ে আসা বোধহয় উচিত হয়নি। তবু, এ যেন চলছে নিজের খেয়ালে, এবং পরিণতি কোথায়, তা আমিও জানি না! নবপর্যায় কৃত্তিবাসে অবশ্য রচনা দিতে কার্পণ্য করেনি শংকর, গত পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে তার গল্প, বিভিন্ন সংখ্যায় কবিতা, মাত্র এক সংখ্যা আগেই সে দিয়েছে তার গুচ্ছ কবিতা।

আমাদের কোনো বন্ধুর মৃত্যু এই প্রথম। আমার ঈশ্বর নেই, পরলোক বা

পুনর্জন্মে বিশ্বাস নেই, আমি জানি শংকরের সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হবে না। তবু চোখের সামনে এখনো সে কত জীবন্ত হয়ে আছে। আর একটা আফসোস হয়, যদিও কোনোদিন ওর ওপর সত্যিকারের রাগ করিনি, তবু মাঝে মাঝেই ওকে ধমকেছি, ওর দু'-একটা গোঁয়ার্তুমি শোধরাবার জন্য রূঢ় কথা বলেছি। যেন সে অধিকার আমার ছিল। কেন আর একটু ভালো ব্যবহার করিনি, কেন সে সময়টুকু ও দিল না। আর একরকম চিন্তাও আসে। হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়, এবার কি আমার পালা? নতুন সিগারেটের প্যাকেট থেকে প্রথম সিগারেটটা বার করার সময় একবার মনে হয়. এবার বোধহয় সিগারেটটা ছেড়ে দিলেই হয়। তারপরই ক্ষীণ হাসি পায়। আমার ধারণা, পঞ্চাশের লেখকরা কেউ দীর্ঘজীবী হবে না। আমরা অল্প সময়ে আমাদের অনেকখানি প্রাণশক্তি খরচ করে ফেলেছি। এবার ক্রমে ক্রমে সরে পড়তে হবে এবং সেটাই বোধহয় ভালো।

শংকর, শংকর, তুই কেন এত তাড়াতাড়ি আমাদেরও আগে চলে গেলি?

* শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুতে লেখা এই সম্পাদকীয়তে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, শক্তি—শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার—শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সন্দীপন—সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উৎপল—উৎপলকুমার বসু, দীপক—দীপক মজুমদার, শ্যামল—শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, তারাপদ—তারাপদ রায়।

আমাদের শিক্ষার মধ্যে এখন ধর্মের বিশেষ কোনো স্থান নেই। ধর্ম আলোচনা ও জ্ঞানচর্চা এখন দুটি আলাদা ব্যাপার হয়ে গেছে। যদিও এদেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই এখনো ধর্মপ্রবণতা বা ধর্মীয় সংস্কার প্রবল কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে ধর্মের বিশ্লেষণ হয় না, নির্লিপ্ত জ্ঞানচর্চাই যেন সেখানকার একমাত্র উদ্দেশ্য। (অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জ্ঞানচর্চাও এখন তেমন হয় না, বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি নিছক ডিগ্রি উৎপাদনের কারখানা মাত্র কিন্তু সেটা অন্য প্রসঙ্গ)। অযোগ্যভাবে পরীক্ষাগুলি পরিচালনা করা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আর কোনো কার্যক্রম আমরা ইদানীংকালে দেখিনি। সম্প্রতি বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয় একটি অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীনরসিমাইয়া একটি কমিটি গঠন করেছেন, যে

কমিটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে যদিও বলা হয়েছে সত্যের অনুসন্ধান, কিন্তু আসলে তা ধর্ম, গুরুবাদ এবং অলৌকিকত্ব বিষয়েও জড়িত।

সম্প্রতি গুরুবাদ ও নানাপ্রকার ভেল্কির প্রাবল্য এসেছে। মানুষ যখনই বেশি দুর্বল হয়, তখনই এগুলি বেশি করে আশ্রয় করে। আমাদের দেশে প্রকৃত ধার্মিক বা জ্ঞানযোগীরা অবশ্য ভেল্কি ব্যাপারকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত উক্তি আছে, যে সাধু যোগবলে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যায় সে খেয়ার দু'পয়সা বাঁচায় মাত্র, আর বেশি কিছু পায় না। স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে বলেছিলেন, তোমাদের মহাপুরুষ যীশু যদি ম্যাজিকগুলি না দেখাতেন, তা হলে তাঁকে আরও বেশি শ্রদ্ধা করতাম। দুঃখের বিষয়, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কেও দু'-একটি অলৌকিক কাহিনী তাঁর ভক্তরা পরবর্তীকালে প্রচার করেছেন।

ইদানীংকালে নানারকম ছোটোবড়ো গুরু প্রচুর রকম অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখান—এরকম শুনতে পাই। এইসব গুরুদের শিরোমণি দক্ষিণ ভারতের হোয়াইটফিল্ড গ্রামের সাঁইবাবা। গুজব অনুযায়ী, তিনি বিধানচন্দ্র রায়ের চেয়েও অনেক বড়ো ডাক্তার, প্রায় ধন্বন্তরি বলা যায়, তাছাড়া তিনি হাওয়া থেকে নানারকম জিনিস, যেমন ঘড়ি, আংটি, লকেট ইত্যাদি বানাতে পারেন। সাঁইবাবা মহাপুরুষ হতে পারেন এবং অসংখ্য ভক্ত যখন তাঁর কাছে সান্ত্বনার জন্য যায়—তখন তাঁর নিশ্চয় আলাদা কোনো শক্তি আছে। আমি অবশ্য বিরক্ত অন্য ব্যাপারে। প্রায়ই সাঁইবাবার নাম প্রচারের জন্য অনুরোধ করে টাইপ করে অজ্ঞাতনামা চিঠি আসে আমার নামে। তার প্রত্যেকটি চিঠিই আমি ফেলে দিই, তবু আসে। পোস্টকার্ডে গুরুমাহাত্ম্য প্রচারের মহিমা বুঝে ওঠা আমার পক্ষে দুষ্কর।

যাই হোক, শ্রীনরসিমাইয়া সাঁইবাবার মহাপুরুষত্ব সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলেননি। তিনি শুধু ঐ অলৌকিক ব্যাপারগুলি একটু পরীক্ষা করে দেখতে চান। সাঁইবাবা হাওয়া থেকে এমন সব জিনিস সৃষ্টি করেন, যেমন ঘড়ি, আংটি, লকেট, ফুল, কমলালেবু—এগুলি সবই আমার আস্তিনে বা হাতের মুঠোয় আগে থেকে লুকিয়ে রাখা যায়। দক্ষ ম্যাজিশিয়ানের পক্ষে এ কাজ অতি সোজা। সাঁইবাবা যে সেরকম কিছু করছেন, এমন সন্দেহ আগে থেকেই প্রকাশ না করে তাঁকে শুধু বিনীতভাবে অনুরোধ করা হয়েছে, তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করুন যা হাতের মুঠোয় ধরা যায় না। যেমন ধরা যাক, একটা লাউ বা কুমড়ো? সাঁইবাবা

এ প্রস্তাবে রাজি হননি, তিনি উল্টে ঘোষণা করেছেন যে মহাপুরুষদের পরীক্ষা করার অধিকার কারুর নেই। চিরকাল অলৌকিক কারবারীরা এই একই কথা বলে এসেছেন। তবে, নিছক অবিশ্বাসী বা কৌতূহলী লোক তো নয়—একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে নিয়ে গঠিত কোনো কমিটি যদি একটি সত্যের পরীক্ষা নিতে চান—তখন তাকে অস্বীকার করা মানে কুসংস্কারকেই প্রশ্রয় দেওয়া বলে মনে হয়।

কিছুদিন আগে সংবাদ বেরিয়েছিল. সিংহল থেকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক ডাক্তার তাঁর পকেটে এক লক্ষ টাকা নিয়ে এদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে-কোনো একজন সাধু যদি একটি মাত্র অলৌকিক ব্যাপারও তাঁর সামনে সংঘটিত করতে পারেন, তাহলে তিনি ঐ একলক্ষ টাকা তক্ষুনি দান করবেন। তিনি নিরাশ হয়ে ফিরে গেছেন। সাধুরা যে তাঁর ঐ টাকা অগ্রাহ্য করে তাঁর কাছে আসেননি তা কিন্তু নয়. অনেকে এসেছিলেন এবং বাজে ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে ধরা পড়ে যান।

ইউরি গেলার নামে একজন মার্কিন দেশীয় ইহুদি নানা জায়গায় বহু লোকের চোখের সামনে কিছু কিছু অত্যাশ্চর্য কাণ্ড দেখাচ্ছিলেন। যেমন তিনি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই একটা লোহার চামচ বেঁকে যায়। বন্ধ খামের মধ্যে কোনো ছবি আঁকা কাগজ থাকলে তিনি না দেখে সেই ছবিগুলো এঁকে দিতে পারেন, ইত্যাদি। ব্যাপারটা বেশ প্রচারিত হয়ে যাবার পর মার্কিন দেশের একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা ইউরি গেলারকে নিয়ে গিয়ে তাঁদের গবেষণাগারে কিছুদিন আটকে রাখেন, যাতে বাইরের আর কারুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ না থাকে। এরপর ইউরি গেলারের ওপর পরীক্ষা চালানো হয়। দু'-একটিতে তিনি পাস করেছেন। দু'একটিতে পাস করতে পারেননি। পরীক্ষার বিস্তৃত ফলাফল আমি জানি না, তবে বৈজ্ঞানিকরা বলেছিলেন. এ নিয়ে আরো গবেষণা করতে হবে—এখুনি কোনো মতামত দেবার সময় আসেনি।

গেলারের ব্যাপারটার সঙ্গে অবশ্য ধর্মের সম্পর্ক নেই। ই. এস. পি. অর্থাৎ এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশান বা বিশেষ ধরনের মানসিক শক্তি সম্পর্কে আজকাল অনেকেই চিন্তা করছেন—এবং এই শক্তি বস্তুর ওপরেও প্রভাব ফেলতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এরকম শক্তি যাঁর আছে বা যিনি ঐ প্রকারে শক্তিমান বলে দাবি করেন, তাঁর পক্ষে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় অসম্মত হওয়ার কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না। আরো একটা কথা

আছে! ইউরি গেলার তাঁর কাণ্ডকারখানাগুলো দেখাতেন নাইট ক্লাবে, আমাদের গুরুরা ঐগুলি দেখান আশ্রমের চত্বরে, ধূপধুনোর গন্ধ মিশিয়ে। দুটি যদি একই ব্যাপার হয়, তবু মানুষের উপর এর প্রভাব আলাদা।

এই সেপ্টেম্বরে নবপর্যায় কৃত্তিবাসের দু'বছর পূর্ণ হলো। এই দু'বছর ধরে, এক-গুঁয়ের মতন প্রায় প্রতিমাসেই যে এই পত্রিকা ঠিকঠাক বার হয়ে আসছে, সেটা খুবই বিস্ময়ের কথা। এই পত্রিকার আগেকার ইতিহাসে এরকম নিয়মিত প্রকাশ প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা ছিল. কবিতার কৃত্তিবাস নামে ত্রৈমাসিক হলেও প্রথম থেকেই বেরুতো চার-পাঁচ মাস অন্তর, কখনো বছরে দুটি মাত্র সংখ্যা, এমনকি একবার সারাবছরে একটিমাত্র সংখ্যা প্রকাশেও সক্ষম হয়েছিল। বেশ-কিছুদিন পর যখন অনেকেরই ধারণা হতো, এবার বুঝি কৃত্তিবাস উঠেই গেল, ঠিক সেই সময়েই কৃত্তিবাসের আর একটা সংখ্যা হুস্ করে বেরিয়ে আসতো। এই রকম মজা হতো তখন। এখন কৃত্তিবাস নিয়মিত হয়ে যাবার ফলে আমরা অনেকটা সাধারণ হয়ে গেছি। অবশ্য এই কৃতিত্ব বা অকৃতিত্ব সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব কোনো বিশেষ উদ্যোগ নেই। এ পত্রিকা যেন একটা আলাদা প্রাণ পেয়ে গেছে, এ চলছে এখন সম্পূর্ণ নিজের নিয়মে। সেই হিসেবে এটিকে এখন একটি 'প্রাণবন্ত' পত্রিকাই বলা যেতে পারে। এবং এই প্রাণশক্তি নিয়ে কৃত্তিবাস যদি হঠাৎ এক-দিন নিজের খেয়ালে নিরুদ্দেশে চলে যায়, তাতেও আমাদের তেমন হাত থাকবে না।

এই দু'বছরে কৃত্তিবাসের সাফল্য কতটুকু? কৃত্তিবাস আমাদের অনেকেরই প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারেনি। আরো সবল, তেজী ও দুর্দান্ত হবার কথা ছিল এর। তার বদলে এর চেহারা অনেকটা শান্ত ও ভালো ছেলে ধরনের। এর জন্য, স্বীকার করতে আপত্তি কি, আমাদের সম্পাদকীয় নীতিই অনেকটা দায়ী। যে পত্রিকার সম্পাদক বছরে বেশ কয়েকবার বাইরে পালায় সে পত্রিকা আর কতটা শক্ত হবে? তাছাড়া, নিজেরা সবাই মিলে লিখে খুব রাগী ও বিতর্কমূলক একটি পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা প্রথম থেকেই আমাদের ছিল না। আমাদের লক্ষ্য ছিল নতুন

লেখকদের প্রতি। বাংলা ভাষায় অসংখ্য তরুণ-তরুণী সাহিত্য রচনায় ব্রতী, তাঁদের সকলের রচনা প্রকাশের ঠিকমতন সুযোগ ও স্থান নেই। বিশেষত কলকাতার বাইরের নবীন লেখকদের এরকম অভিমান আছে যে কলকাতার বড়ো বড়ো পত্রিকাগুলির গোষ্ঠীপ্রীতি আছে, অজ্ঞাতকুশলীদের সেখানে স্থান নেই ইত্যাদি। গোষ্ঠীপ্রীতি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, আমি নিজে দূর থেকে ডাক-মারফৎ লেখা পাঠিয়ে অনেক পত্রপত্রিকায় স্থান পেয়েছি, এবং এরকম আরও অনেকের কথা শুনেছি। কিন্তু আগেকার চেয়ে এখন লেখকের সংখ্যা অনেক বেশি এবং পত্রিকার সংখ্যা কম, স্থানাভাব যে অত্যন্ত প্রকট. এতে সন্দেহ নেই। আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত মন নিয়ে নবীনদের রচনাই অধিকসংখ্যক গ্রহণ করতে চেয়েছি। এই দু'বছরে খ্যাতনামা লেখকদের চেয়ে সম্পূর্ণ নতুন লেখকদের রচনা ছাপা হয়েছে অনেক বেশি। ডাক-মারফত যে-সব গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ আসে, খুব বেশিই আসে, তার থেকে যত্ন করে নির্বাচন করা হয়েছে রচনা। তবু এর অনেক রচনাই নতুন পাঠকদের মনঃপূত হয়নি, অনেকের অভিযোগ, কৃত্তিবাসের গল্প অংশ দুর্বল। দু'বছর আমরা এরকম পরীক্ষা করলাম। আগামী সংখ্যা থেকে আমাদের নীতি বদল হচ্ছে, রচনা নির্বাচন হবে আরও কঠোরভাবে এবং প্রত্যেক সংখ্যাতেই মুদ্রিত হবে কিছু আমন্ত্রিত রচনা।

কবিতা-পত্রিকা থেকে কৃত্তিবাসের এই রূপান্তরে অনেকেই দুঃখ পেয়েছেন। আমরাও পাই। তবে, আগেই বলেছি, এটাই বোধহয় এই পত্রিকার নিয়তি ছিল। এবং একথাও বলা দরকার, এখনকার কৃত্তিবাসে এক বছরে যত কবিতা মুদ্রিত হয়, আগেকার কৃত্তিবাসে তা হতে পারেনি কখনো। বাংলা ভাষায় আর কোনো মাসিক পত্রিকায় এত বেশি সংখ্যক কবিতা আগেও কোনোদিন প্রকাশিত হয়নি, এখনো হয় না। এবং কৃত্তিবাসে লেখেন দলমতনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর কবি। বর্তমান বাংলায় যে-রকম কবিতা লেখা হচ্ছে তার একটি দর্পণ দেখা যাবে কৃত্তিবাসে। কেউ কেউ বলেন অন্যান্য গদ্য রচনার কাছাকাছি কবিতা মুদ্রিত হলে কবিতার কিছুটা সম্মানহানি হয়—কিন্তু এসব কথা নিছক ফাঁকা ভাবালুতা ছাড়া কিছুই না। মূর্খতা বা আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর।

আমাদের সহযোগী 'শতভিষা' পত্রিকার পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং সেই উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে একটি চমৎকার ও মূল্যবান সংকলন। 'শতভিষা' কৃত্তিবাসের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠা। আলোক সরকার এবং দীপঙ্কর দাশগুপ্তের উদ্যমে ও যত্নে এই পত্রিকাটি নিজের প্রতিষ্ঠা করে নিতে পেরেছে অচিরকালেই। 'শতভিষা' বরাবরই ক্ষীণকায়া, কিন্তু আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। একালের পরিচিত অনেক কবিই এই পত্রিকাকে অবলম্বন করে প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং দলমতনির্বিশেষে সকলেই আগ্রহী হয়েছেন এই পত্রিকায় রচনা দিতে। অন্য কোনো বিচার নয়, কবিতা হবে বিশুদ্ধ কবিতা—এটাই যেন ছিল 'শতভিষা'র দাবি। এই পত্রিকায় যেমন জীবিত অবস্থায় রচনা দিয়েছেন জীবনানন্দ দাশ, তেমনি অতি তরুণ কারুর রচনাও সাগ্রহে গৃহীত হয়েছে। আমাদের মনে আছে, লেক বাজারের দোতলায় আলফা কাফে নামের একটি চায়ের দোকানে ছিল প্রথম দিকে 'শতভিষা'র অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর আড্ডাস্থল। সেখানে স্বল্পভাষী আলোক সরকার এবং বৈয়াকরণ অথচ সুরসিক দীপঙ্কর দাশগুপ্তকে ঘিরে সমবেত হতেন অনেকেই। যাঁদের মধ্যে প্রাণোচ্ছল শংকর চট্টোপাধ্যায়ের কথাই আজ বেশি করে মনে পড়ে।

'শতভিষা'র প্রথম প্রকাশের বেশ কয়েক বছর পর জন্ম হয় কৃত্তিবাসের। এই দুই পত্রিকার মধ্যে কখনো কোনো প্রতিযোগিতা ছিল না। উদীয়মান কবিরা সব সময়েই স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে লিখেছেন এই দুই পত্রিকাতেই, তাঁরা পেয়েছেন একটির বদলে দুটি আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র। এই দুই পত্রিকার ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারে একটি কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। দুটি পত্রিকার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তারাপদ রায়। তাঁর বিবাহের পর তাঁর স্ত্রী যখন সন্তানসম্ভবা হন, সেই সময়েই তিনি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে তাঁর কন্যা জন্মালে নাম রাখা হবে শতভিষা, পুত্র হলে কৃত্তিবাস! শতভিষাকে তরুণ কবিরা আর-একটি শ্রদ্ধার অভিধা দিয়েছিলেন। তাঁরা বলতেন, শত শত কবিকে ভিসা দেওয়া হয় বলেই এই পত্রিকার নাম 'শতভিষা'।

কৃত্তিবাসের মতন, 'শতভিষা'রও দু'একবার সম্পাদক বদল হয়েছে। আদি সম্পাদকদ্বয় বর্তমানে কার্যান্তরে ব্যস্ত থাকায় এখন সম্পাদনার ভার নিয়েছেন দুই তরুণ কবি -শ্রীযুক্ত অভিরূপ সরকার এবং শ্রীযুক্ত সুরজিৎ ঘোষ। এঁরা দুজনে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক সংখ্যাটি প্রকাশ করেছেন—এজন্য

তাঁদের অভিনন্দন জানাই ! এর আগে পঁচিশ বৎসর পূর্ণ করতে পেরেছে মাত্র দুটি বাংলা কবিতা-পত্রিকা, বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' এবং শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত 'একক'। সে দুটি পত্রিকার আর অস্তিত্ব নেই এখন। আমরা আকাঙ্ক্ষা করি 'শতভিষা' থেমে থাকবে না, সে শতায়ু হবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে পবিত্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কবিপত্র', বিমল রায়চৌধুরী-কবিতা সিংহ সম্পাদিত 'দৈনিক কবিতা', সুনীল রায় সম্পাদিত 'ধ্রুপদী', শান্তনু দাস সম্পাদিত 'গঙ্গোত্রী', তারাপদ রায় সম্পাদিত 'কয়েকজন', অঞ্জন সেন সম্পাদিত 'গাঙ্গেয় পত্র' প্রভৃতি প্রত্যেকেই বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়ে আছে। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত এবং মণীশ নন্দীর যুগ্ম-উদ্যোগে বেরিয়েছে একটি চমকপ্রদ নতুন কাব্য-পত্রিকা, 'বিভাব'। তরুণতরদের সম্পাদনায় বেরুচ্ছে আরো অনেকগুলি পত্রিকা। আশা করি অকালমৃত্যু এড়িয়ে এরাও সকলে বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করে যাবেন।

আর একটি পত্রিকার প্রতি আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যেটি প্রকাশিত হয় দিল্লি থেকে। পত্রিকাটির নাম 'বাগর্থ'। কিন্তু এর ভাষা ইংরেজি এবং একথাও সঙ্গে সঙ্গে বলা দরকার, পত্রিকাটিতে নিছক ইংরেজিয়ানা নেই, পত্রিকাটি সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয় কাব্য-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি নিবেদিত। বিভিন্ন ভারতবর্ষীয় ভাষার রচনার অনুবাদ ছাড়াও নানান দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা মননশীল মৌলিক প্রবন্ধও এতে স্থান পায়। এমন-কি, কমলকুমার মজুমদারের ভাষাসৌকর্য বিষয়ে আলোচনাও আমি এ পত্রিকায় দেখেছি। সর্বভারতীয় সংস্কৃতি সমন্বয় হয়তো এখনো পর্যন্ত একটি অলীক বস্তু, তবু মোটামুটিভাবে এ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে নেওয়া যায় এই পত্রিকা থেকে। এবং এর আয়োজন বিরাট না হলেও নিষ্ঠার কোনো অভাব নেই। পত্রিকাটির সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সওদাগরের নৌকা' নাটকটি দেখতে গিয়ে কয়েকটি কথা মনে আসে। নাটকটির বৈশিষ্ট্য এই যে এটি ঐ বিখ্যাত পরিচালক ও অভি-

নেতার নিজস্ব রচনা। আজকাল ভালো নাট্য প্রযোজনা মানেই কোনো বিখ্যাত বিদেশী নাটকের ভাবানুবাদ, এমনকি প্রাচীন গ্রীক নাটকে পর্যন্ত পিছিয়ে যাওয়া হয়েছে। ব্রেখ্‌ট কিংবা ব্রেষ্‌ট যে-কোনো কারণেই হোক বাংলা মঞ্চে, বাঙালি পোশাকে বেশ জনপ্রিয়। কোনো কোনো নাট্যগোষ্ঠী দেশীয় নাটকের সন্ধানে সংস্কৃত বা গিরীশ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথে আশ্রয় খুঁজেছেন। মৌলিক বাংলা নাটক প্রায় নেই-ই চলা চলে। আছে, কিছু লেখা হয়। মঞ্চে অভিনীত হতেও থাকে, কিন্তু সেগুলি নাট্য সাহিত্যের অঙ্গ হয়ে ওঠে না। ব্রেখ্‌ট বা ব্রেষ্‌ট, আর্থার মিলার, পিণ্টার, অ্যালবি প্রমুখদের রচনা নাট্য সাহিত্যের অন্তর্গত হয়েছে নিঃসন্দেহে।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকটি মনোমুগ্ধকর। ঘটনার ঘনঘটা প্রায় নেই বললেই চলে, চরিত্রগুলি অল্প পরিসরে ঘোরাফেরা করে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও মনোযোগ অন্যত্র যায় না। কিন্তু কয়েক জায়গায় সংলাপের ভাষা কানে খট্‌কা লাগায়। বড় বেশী রাবীন্দ্রিক মনে হয়। এক যাত্রা-অভিনেতার মহিমা থেকে পতনের সময় এমন ভাষা ? ঐ অভিনেতারা আড়ম্বরবহুল ভাষা পছন্দ করে নিশ্চিত, কিন্তু তা রবীন্দ্রনাথের ভাষা থেকে অনেক দূরে। যাইহোক, ঐ নাটক বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে, শুধু এইটুকু এখানে বলা যায় যে মৌলিক নাট্য-সৃষ্টির পথে 'সওদাগরের নৌকা' একটি চমৎকার চেষ্টা।

বাংলা সিনেমা রসাতলে যেতে বসেছে। যাত্রার অভ্যুত্থান এখন খুবই সরব, কিন্তু কতোটা মনোহর, সে সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই, প্রদর্শন-শিল্পে কয়েক দলের নাট্য প্রযোজনা আমাদের এখন পর্যন্ত তৃপ্তি দেয়। সেইসব প্রযোজনায় এমন মৌলিক নাটকের আবির্ভাব হলে আমরা প্রকৃতই তৃপ্তি পেতে পারি।

বাইরে থেকে ফিরে এসে একটা দুঃসংবাদ শুনলাম। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে একদিন কমলকুমার মজুমদার পরিচালিত নাটকের অভিনয় দর্শকরা পণ্ড করে দিয়েছে। তারা শুধু নাটকটি বর্জন করেই ক্ষান্ত হয়নি, এক শ্রেণীর দর্শক লাঠিসোঁটা হাতে নিয়ে মঞ্চের ওপর হুড়োহুড়ি শুরু করে দেয় অর্থাৎ তারাই একটি উৎকৃষ্ট নাটক ঘটায়। কমলকুমার পরিচালিত ছোট-ছোট নাটকগুলিতে কোনোরকম রাজনীতি

নেই, তথাকথিত শ্লীলতা-অশ্লীলতার কোনো প্রশ্নই নেই। নাটকগুলি নির্মল হাস্য-রসের, ছোট-ছোট ছেলেদের নিয়ে কমলকুমার এগুলির অভিনয় করান। বোঝা যাচ্ছে, দর্শকরা এর রস উপলব্ধি করতে পারেনি, প্রয়োগরীতি তাদের কাছে দুর্বোধ্য লেগেছে—সেক্ষেত্রে স্থানত্যাগ করাই যথেষ্ট মনে করেনি তারা, সবলে অভিনয় বন্ধ করে দিয়েছে। এরকম ফিলিস্টিনীয় মনোভাব বাঙালীদের মধ্যে কবে থেকে জাগ্রত হলো জানি না।

এ ব্যাপারে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন কর্তৃপক্ষের নিশ্চিত কোনো দায়িত্ব নেই। তাঁরা কমলকুমার মজুমদারের নাটককে যোগ্য ভেবেই মঞ্চে স্থান দিয়েছেন, দর্শকের রুচি যদি তা অপছন্দ করে, তবে উদ্যোক্তাদের দোষ কি! ঠিক। কিন্তু দর্শকদের রুচি ফেরাবার ব্যাপারেও এইসব বৃহৎ সম্মেলনে দু'-একটা ছোটখাটো কাজ শুরু করলে মন্দ হয় না। যেমন, এই নাটকগুলি শুরু হবার আগে কমলকুমার মজুমদারের নাট্য প্রয়োগরীতি এবং তা অন্যদের থেকে কী ভাবে আলাদা, সে সম্পর্কে একটি ছোটোখাটো আলোচনার ব্যবস্থা করা যেতে পারতো। দর্শকরা নতুন কিছুর জন্য মনে মনে প্রস্তুত হতেন। কিন্তু দুঃখের কথা, এ-বৎসর বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের কোনো অনুষ্ঠানে সাহিত্যেরই কোনো স্থান নেই। বাংলা সাহিত্য বাংলা সংস্কৃতির অঙ্গ নয়, এমন ধারণা হয়।

জীবিত বাঙালীদের মধ্যে কমলকুমার মজুমদার অতি বিশিষ্ট। বাংলা সাহিত্যের মূল প্রবাহ থেকে আলাদা হয়ে তিনি নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্বীপ; তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে অন্য কারুর মিল নেই, এইজন্য তিনি সর্ব অর্থে নতুন। তাঁর রচনার পাঠক সংখ্যা কম হলেও সকলেই বিশ্বাসী ও অতি অনুরক্ত এবং এ বিষয়ে দ্বিধা রাখার কোনো কারণ নেই যে তিনি কোনো বিশ্ব লেখকের, যেমন মার্সেল প্রুস্ত বা জেমস জয়েস, সমগোত্রীয়। সম-সাময়িক কাল এঁদের চিনতে অনেক সময়ই ভুল করে।

শুধু লেখক নন তিনি, তাঁর কৃতিত্ব আছে ছবি আঁকায় এবং ছবি সমালোচনায়। এক সময়ে আমরা তাঁকে প্রায়ই উডকাট করতে দেখতাম, তখন তাঁর কণ্ঠে গুন-গুনোতো রাগ-সঙ্গীত এবং বাংলার বিভিন্ন জেলার লোকশিল্প বা উচ্চারণ পদ্ধতি সম্পর্কেও তাঁকে একজন বিশেষজ্ঞ বলা যায়। নাটকও তাঁর বহুদিনের ব্যসন।

আমাদের যখন সবেমাত্র গোঁফের রেখা উঠেছে, সেই সময় কমলকুমার মজুমদার এরকম গুটি কয়েকজনকে নিয়ে একটি নাটকের দল গড়েছিলেন। মূল উদ্যোক্তা দিলীপকুমার গুপ্ত, সংক্ষেপে ডি. কে., যিনি একদা ছিলেন বিজ্ঞাপন

জগতের এক দৈত্য ! সংগীতের ভার নিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র অর্থাৎ বটুকদা এবং ফৈয়াজ খাঁর শিষ্য সন্তোষ রায়। শিল্প নির্দেশক সত্যজিৎ রায়। এবং কমলকুমার মজুমদার পরিচালক। কালো পাড় ধুতি ও লক্ষ্ণৌ-এর কলিদার পাঞ্জাবী পরা এক বলিষ্ঠকায় কালো মানুষ, প্রথম আলাপেই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বাবুটির পিতার নাম কি ? নিবাস কোথায় ? আমার পূর্ববঙ্গে জন্ম শুনে তিনি খুব উপহাস করেছিলেন। এসব যে এক ধরনের কায়দা বা সোফিসটিকেশান, তা বুঝতে আমাদের ঢের সময় লেগেছিল। কেননা, আমি প্রকৃতই বাঙাল ছিলাম।

আমাদের প্রথম পালা 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'। দীপক মজুমদার সুগ্রীব, এখন 'অমৃত' সাপ্তাহিকের জেনারেল ম্যানেজার রমেন গুহ হনুমান, সুনন্দ গুহঠাকুরতা (এখন বহু ভাষাবিদ) রাম। এখনকার প্রখ্যাত বিজ্ঞান-শিল্পী শ্যাম গুহ হয়েছিলেন দূত। এবং সম্ভবত আমার আকৃতির জন্যই আমাকে দেওয়া হয়েছিল জাম্বুবানেব ভূমিকা।

কমলকুমার রবীন্দ্রনাথকে বলেন রবি ঠাকুর, খৃষ্টানদের চোখে যেমন ইহুদী, তাঁর চোখে তেমনি বেম্মো। তাঁর মতে বঙ্কিম ছাড়া আর কেউ কিছু লিখতে জানে না। তিনি মূল ফরাসী ভাষার উপন্যাসের পাতার ফাঁকে ফাঁকে টাকা রাখেন, অর্থাৎ সরস্বতী-লক্ষ্মী একসঙ্গে। তাঁর মুখের ভাষা কলকাতার খাঁটি কথ্য ভাষা, তেমনি সরস ও সরল, তাঁর লেখার ভাষা পৃথিবীর দুর্বোধ্যতম গদ্যের উদাহরণ। সেই সময় সারাদিন কেন যে তিনি অনবরত লবঙ্গ বা এলাচ খান, সে রহস্য বুঝেছিলাম বহু পরে, যখন সেই ব্যাপারে তিনি নিজে আমাদের দীক্ষা দিয়েছিলেন। এরকম একটি ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন হয়ে আমাদের মতন সদ্য যুবকরা যে হকচকিয়ে যাবো, তা আর এমন কথা কি ?

তিনি অ আ ক খ'র মতন ধরে ধরে আমাদের উচ্চারণ শিখিয়েছিলেন। গানের গলা থাক বা না থাক প্রত্যেককে হারমোনিয়ামে সা-রে-গা-মা সাধতে হবে, নইলে অভিনয় করা যায় না, এই ছিল তাঁর নির্দেশ। রিহার্সাল হয়েছিল, কম করেই বলছি, অন্তত একশোবার। অর্থাৎ শুধু নিজের ভূমিকাটুকুই নয়, গোটা নাটকটাই সকলের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এবং অভিনয়ের সময় যাকে বলে অ্যাকশান, তা তিনি আমাদের গোড়া থেকেই শিখিয়ে দেননি, প্রত্যেকদিন নতুন নতুন উদ্ভাবনা হতো এবং অভিনয়ের দিন মঞ্চে প্রবেশের ঠিক আগের মুহূর্তে তিনি বিভীষণকে দিয়েছিলেন তাঁর পোশাকটি। সেই মুহূর্তে রচিত।

মঞ্চে, ব্যাকগ্রাউণ্ডে কোনো দৃশ্য ছিল না। সমান দুটি ভাগ করে ছিল মঅভ এবং লেবু-হলুদ রঙের দুটি স্ক্রিন। অভিনেতাদের পোশাকের রঙের ডিজাইনও এমন যে এক রঙের পরিপ্রেক্ষিত থেকে অন্য রঙে গেলে স্পষ্ট বদল টের পাওয়া যায়। নাটক-অভিনয়ের দুটি দিক আছে। একটি দৃশ্যত অপরটি শ্রোতব্য, খুব কম পরিচালকই এই দুটি নাটকের প্রতি সমান নজর দিতে পারেন বা ঐ বিষয়ে ভাবেন। এই নাটকে প্রতিটি পদক্ষেপ প্রতিটি কমপোজিশান ছবির মতন, সামান্য স্থান-পরিবর্তনে যে ছবির টোন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। উচ্চারণ খুবই স্টাই-লাইজড্। কারণ এই নাটক বাস্তব-সংসারের সংলাপ নয়, সাধারণ স্ল্যাপস্টিকের সঙ্গে আমাদের পরিচালক অনেকটা অপেরার ভঙ্গি মিশিয়েছিলেন। উচ্চারণ বিষয়ে তাঁর অনেক রকম অদ্ভুত তত্ত্ব আছে। তাঁর মুখেই আমরা শুনেছি যে "আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল", এই বিখ্যাত উক্তির সময় গিরিশচন্দ্র নাকি 'বাগান' না বলে 'বাংকান' বলতেন, দূর থেকে তাতেই শব্দটি অনেক বেশি শোকাবহ মনে হতো।

পর পর চার শনি রবি অভিনীত হয়েছিল নাটকটি. এলগিন রোডে সিগনেট প্রেসের বাড়ির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে, নিজস্ব মঞ্চে। দুর্দান্ত সফল যে হয়েছিল, এতে যাঁরা সন্দেহ করবেন, তাঁরা সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনা সংগ্রহ খুঁজে দেখুন, প্রমাণ পেয়ে যাবেন। এই সময় দৈনিক পত্রে আলী সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঐ নাটক অভিনয় বিষয়ে এককলম লিখেছিলেন। এই নাটক দেখতে এসেছিলেন অচিন্ত্য-প্রেমেন-বুদ্ধদেব থেকে শুরু করে বহু লেখক ও শিল্পী।

এর পরেও আমাদের 'হরবোলা' নামের দলে কমলকুমারের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'র অভিনয় এবং অবনীন্দ্রনাথের 'লম্বকর্ণ পালা'র রিহার্সাল চলেছিল। মুক্তধারা হয়েছিল অধিকতর জাঁকজমকের সঙ্গে, কিন্তু আগেরটির মতন অত সার্থক হয়নি। কিন্তু একটি অক্ষরও বাদ না দিয়ে সম্পূর্ণ 'মুক্তধারা'র অভিনয় কলকাতার মঞ্চে আগে কখনো হয়নি বোধহয়, এখনো হয় না। পঞ্চাশ ষাটজন কুশী-লব নিয়ে সে এক এলাহী ব্যাপার। 'লম্বকর্ণ পালা' মঞ্চেই উঠলো না। হরবোলা যেন অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেল, সে ইতিহাস লেখার জায়গা এটা নয়। কমলকুমার ও দিলীপকুমার. এই দুই বিশাল পুরুষের সংঘর্ষ কোনো মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হতে পারে।

নাটকের ঝোঁক কমলকুমারের যায়নি। এর পরেও, তিনি যে-স্কুলে পড়ান, সেখানকার ছাত্রদের নিয়ে 'এমপারার জোনস্'-এর অভিনয় করিয়েছেন। এবং ইদানীং অন্যান্য নাটক আবার করছেন। তবে স্ল্যাপস্টিক বা মজার নাটকেই তাঁর

দক্ষতা বেশী। সেইজন্য তিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভীম বধ', আংশিক গিরিশ ঘোষ ও আংশিক স্বরচিত 'দানসা ফকির' বা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কঙ্কালের টংকার'—এইসব ছোট নাটক বেছে নিয়েছেন। শেষোক্ত দুটি নাটকের অভিনয় আমরা কয়েকমাস আগেই দেখেছি বালিগঞ্জ শিক্ষা সদনে। দিলীপকুমার গুপ্তের মতন একজন উদার পৃষ্ঠপোষকের অভাব প্রথমেই অনুভব করলাম। দিলীপকুমার গুপ্তের সেই ভালোবাসাময় দিনগুলির কথা ভেবে একটু মন খারাপ লাগছিল। কিন্তু কমলদা ঠিক সেই রকমই আছেন, নাটকে সাজ-সরঞ্জামের অভাব প্রকট কিন্তু উপস্থাপনা থেকে প্রতিটি সংলাপে তাঁর ব্যক্তিত্বের নির্ভুল ছাপ। তিনি আমোদ দিতে আসেননি, তিনি সৃষ্টি করছেন। এ তো শুধু একটা-দুটো নাটক অভিনয়ের ব্যাপার নয়, এ আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসের এক একটা বিশিষ্ট ঘটনা। কমলকুমার মজুমদার একটি নাটকের অভিনয়-আয়োজন করেছেন, আমরা সেটি দেখতে এসেছি, এই আমাদের সৌভাগ্য, এছাড়া এর ওপরে আর কোনো কথাই ওঠে না।

এ কথা যে দর্শকরা বোঝে না, তারা চুলোয় যাক্!

যাঁরা নাটক ভালোবাসেন, নিছক নাটক নয়, নাটকের শিল্পরস, তাঁরা কমলকুমারের কাছাকাছি সমবেত হোন, এই আমাদের অনুরোধ।

অন্ধকারে কাব্যগ্রন্থ

এটা একটা অদ্ভুত ধরনের সত্যি খবর যে পশ্চিম বাংলার পূর্ত বিভাগ কয়েক হাজার বাংলা কবিতার বই ও পত্র-পত্রিকা গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়ে কোনো এক অন্ধকার গুদামে কুলুপ বন্ধ করে রেখেছে। এটা "জরুরী অবস্থা"র আর একটি কীর্তি নয়, এটা আইন কানুনের জঙ্গলের ব্যাপার।

দক্ষিণ কলকাতার কৃত্রিম হ্রদের নিকটবর্তী প্রান্তরে যে গোলাকার বাঁধানো ক্রীড়াক্ষেত্রটি আছে, তার গায়ে গায়ে বেশ কয়েকটি ছোট কামরাও নির্মিত হয়েছিল এবং এগুলো বিতরিত হয়েছিল কিছু সামাজিক সংস্থার মধ্যে। কবিতার কথা চিন্তা করে কেউ যে কোনো বাসস্থান দেবেন এমন আশা করা যায় না।

তবে, এর মধ্যে একটি কামরা পেয়েছিল লেখক সমবায় কো-অপারেটিভ নামে একটি সংস্থা। এই সংস্থার কার্যবিধি সম্পর্কে আমরা সম্যক অবগত নই। তবে, এই কো-অপারেটিভের দু'জন সদস্য, শ্রীস্বদেশরঞ্জন দত্ত ও শ্রীশান্তি লাহিড়ী নিজস্ব উদ্যোগে সেখানে গড়ে তোলেন একটি কবিতা গ্রন্থাগার। কি বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে যে এই গ্রন্থাগারটি গড়ে উঠেছিল আমি তার একজন প্রত্যক্ষ দর্শক। বিভিন্ন লোকের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে কাকুতি-মিনতি করে এঁরা সংগ্রহ করেছেন কবিতার বই, সেগুলি ঘাড়ে করে নিয়ে গেছেন যথাস্থানে। বহু পুরোনো, লুপ্ত পত্র-পত্রিকাও এঁরা উদ্ধার করেছেন! তিল তিল করে নির্মিত হয় শুধু কবিতারই জন্য আলাদা একটি সংগ্রহশালা। এই কাজে ঐ দুই উদ্যমী যুবকের কোনোপ্রকার স্বার্থ ছিল না, ছিল নিছক নেশা, যার নামান্তর ভালোবাসা।

কৃত্রিম হ্রদের পাশে ঐ ছোট ঘরটিতে প্রতি শনি ও রবিবার জমায়েত হতেন তরুণ কবিরা। সিগারেটের ধোঁয়া ও কবিতা একসঙ্গে মিলে মিশে যেত। মাঝে মাঝে হয়েছে হঠাৎ ডাকা কবি সম্মেলন কিংবা উত্তপ্ত আলোচনা। গবেষকরাও গিয়েছেন নানা কাজে। সবাই জানেন, বড় বড় গ্রন্থাগারগুলিতে কবিতা শাখাটিই সবচেয়ে অবহেলিত, অকস্মাৎ কোনো অল্প-জানা কবির বই চাইলে গ্রন্থাগার-কর্মী চোখ কপালে তোলেন। লেখক সমবায়ের কক্ষে এই ক্ষুদ্র কবিতা গ্রন্থাগারটি ছিল কাকের বাসায় কোকিলের ছানা।

বছর খানেক হলো, ঐ কক্ষ থেকে কবিরা উৎখাত হয়ে গেছেন। প্রথম উৎপাত হয় মহেশযোগীর। শ্রীমৎ মহেশযোগী মহাশয়ের আর যাই গুণপনা থাক, তিনি যে লেখক একথা নিন্দুকেও বলেনি। তবু লেখক সমবায়ের ঘরে চেলা-চামুণ্ডা সমেত তাঁর অকস্মাৎ আবির্ভাবের কারণ বুঝতে পারা যায় না। তারপর মহেশ-যোগী কিছুদিন পর গেলেন তো এলেন পাওনাদার। লেখক সমবায়ের নাকি বহু মাসের ভাড়া বাকি। দরজায় পড়লো তালা, ভেতরের জিনিসপত্র মালিকদের অজ্ঞাতসারেই কোথায় চলে গেল কে জানে। এই ডামাডোলে বেচারি কবিতার বইগুলিও বাজেয়াপ্ত হলো।

বই জিনিসটা পড়বার জন্য, গুদামে বন্দী করে রাখার জন্য নয়। পূর্ত-বিভাগ হঠাৎ কাব্যরসিক হয়ে বইগুলি জবরদখল করে বিরলে পড়তে শুরু করেছেন এমন হলেও আনন্দের কথা হতো। কিন্তু সেরকম কোনো চিহ্ন নেই। বরং সেখানে ইঁদুর ও উইপোকার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকারই সম্ভাবনা।

পত্রান্তরে লেখক সমবায় জানিয়েছেন যে তাঁদের এখন কোনো ভাড়া বাকি

নেই, তবু পূর্ত-বিভাগ তালা খুলছেন না। সেটা তাঁদের ব্যাপার। পূর্ত-বিভাগকে আমাদের অনুরোধ, সম্পূর্ণ নষ্ট হবার আগেই কবিতার বইগুলি কবিদের হাতে ফিরিয়ে দিন। এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে কবিতার স্বাধীন গ্রন্থাগারের জন্য আর একটি কক্ষ বিনা ভাড়ায় বণ্টন করুন অবিলম্বে। আর যদি নিয়মরক্ষার জন্য কিছু ভাড়া নিতেই হয়, তবে আমরা কৃত্তিবাস মারফৎ কবিদের কাছ থেকে সেই ভাড়ার টাকা চাঁদা তুলে দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে রাজি আছি।

দুটি মৃত্যু

পর পর দুটি মৃত্যু আমাদের বিহ্বল করে দিয়েছে। দুটি মৃত্যুই অতি আকস্মিক এবং অসুখ-ব্যতিরেকী বলে আরও বেশি শোকাবহ। দুটি মৃত্যুই জলে।

একটি বাংলা ফিলমের সুটিং-এর সময় কেয়া চক্রবর্তী স্টিমার থেকে গঙ্গায় পড়ে যান। পরদিন পাওয়া গেছে তাঁকে। নিছক দুর্ঘটনাই তাঁর মৃত্যুর কারণ অথবা কারুর দায়িত্বহীনতা, সে বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। সে যাই হোক, কেয়ার মৃত্যুর ক্ষতি আমাদের কাছে অপূরণীয়ই থেকে যাবে। সম্প্রতিকালে 'ভালোমানুষ', 'আন্তিগোনে' নাটকে আমরা তাঁর বিস্ময়কর অভিনয় দেখেছি। কিন্তু কেয়া শুধু অভিনেত্রী ছিলেন না। এই বিদুষী, প্রতিভাময়ী তরুণী ছিলেন আমাদের সংস্কৃতি জগতের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। কেয়াকে আমরা খুব গভীরভাবে হারালাম।

আর যোগব্রত চক্রবর্তী ছিল আমাদের খুব কাছের মানুষ। সে নিজে যত না লিখেছে, তার চেয়ে সাহিত্যকে ভালোবেসেছে অনেক বেশি। অতি সরল ও পবিত্রমনের মানুষ সে, শরীরটা তার দুর্বল। তবু সব সময় দুরন্ত। গত পয়লা এপ্রিল গভীর রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে, পাশের একটি পুকুরে পড়ে যায়। সকাল-বেলা জেলেরা জাল দিয়ে তুলেছে তার দেহ। মৃত্যুর সঙ্গে সে খেলা করেছে অনেকবার, আমরা ভেবেছিলাম মৃত্যুও এটাকে খেলা হিসেবেই নিবে। হঠাৎ খেলার নিয়ম ভেঙে গেল। 'পঁচিশে বৈশাখের কবিতা' নামে একটি বড় আকারের পত্রিকা সে প্রকাশ করতো বছরের ঐ নির্দিষ্ট দিনটিতে। পত্রিকাটি এত সার্থক হয় যে তারপর তাকে অনুকরণ করেছে অনেকে। শেষ দিনেও সে ঐ পত্রিকার জন্য

লেখা সংগ্রহ করতে এসেছিল। যোগো ছিল আমাদের অনেকেরই ভাইয়ের মতন, আমাদের আত্মার একটা টুকরো সে নিয়ে চলে গেল। এখনও বিশ্বাস হয় না ঠিক, যে সে নেই।

পাণিপথের চতুর্থ যুদ্ধ

আমরা রাজনীতি নিয়ে কিছু লিখি না, কিন্তু এই মার্চ মাসের সাধারণ নির্বাচনে ভারতের ভাগ্যে আর একটি যে পরিবর্তন দেখা দিল, তার উল্লেখ এখানে থাক। এমন আচমকা কংগ্রেস শাসনের অবসান হবে আমরা ভাবিনি। পতনের শেষ পর্বে অতি দর্প এসে আশ্রয় করেছিল শ্রীমতী গান্ধীকে। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর হাজার হাজার মানুষকে বিনা বিচারে বন্দী করা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণের মূল্য দিতে হলো তাঁকে। ট্রামে বাসে হুকুমের মতন শ্লোগান আর রেডিওতে 'বিশ দফা, বিশ দফা' এই ন্যাকা অশ্লীল গান—এসব দেখে শুনে দেশটার ওপর ঘেন্না ধরে যাচ্ছিল। সুতরাং এই পরিবর্তন স্বাগত। বৃদ্ধদের নেতৃত্বে নতুন যে সরকার এসেছে, তার ওপরে এখনই বিশেষ ভরসা করার কারণ নেই। তবু, আমরা ভেবেছিলাম, সুস্থ স্বাধীন নির্বাচন এদেশে আর কখনো হবে না। আমাদের সে ধারণা যে ভেঙেছে, এই গরীব দেশের মানুষও যে তাদের ইচ্ছানুসারে সরকার বদল করতে পারে, এটা দেখে প্রবল স্বস্তি পাওয়া গেল।

শেষ সংবাদ

অকস্মাৎ ফণীশ্বরনাথ রেণুর মৃত্যু-সংবাদ পেলাম। হিন্দী-সাহিত্যের এই অতি সম্মানীয় লেখকের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগও ছিল ঘনিষ্ঠ। তিনি কৃত্তিবাসের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন, বছর দু'-এক আগে আমাদের কার্যালয়ে এসে বহুক্ষণ কাটিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুও আমাদের কাছে আত্মীয় বিয়োগের মতন।

বন্দীমুক্তি

এদেশে অচিন্ত্যপূর্ব এক রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে গেল। এশিয়ার অধিকাংশ দেশের মতন ভারতও চলেছিল স্বৈরাচারের পথে, অকস্মাৎ জনগণের রায় তা

প্রতিহত করে দিয়েছে। অনেক কিছুরই পুনর্বিচার হচ্ছে এখন। কিন্তু একটি কথা এখনো সব সময় মনে কাঁটার মতন বেঁধে, এখনো হাজার হাজার তরুণ রয়ে গেছে কারাগারে, তারা আমাদেরই ভাই বা বন্ধু বা সহপাঠী। তারা কেউ সামাজিক অপরাধী নয়, তারাও চেয়েছিল এ দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন। শ্রেণী বৈষম্য, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা গ্রহণ করেছিল সশস্ত্র সংগ্রামের পথ। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে উগ্রপন্থী বা নকশালপন্থী। প্রাক্তন সরকারের আমলে তাদের অনেককে মারা হয়েছে গোপনে গুলি করে, জেলখানায় অসহ্য উৎপীড়নে প্রাণত্যাগ করেছে অনেকে, আরো অনেকে এখনো বিনা বিচারে অন্ধকার কারাগারে ধুঁকছে।

বৃটিশ আমলে যাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের পন্থা নিয়েছিলেন, সরকার পক্ষ থেকে তাঁদের বলা হতো সন্ত্রাসবাদী। কাগজ-পত্রেও সেই নামই রয়ে গিয়েছিলো বহুদিন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন বিপ্লবী এবং দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষের গোপন সহানুভূতি ছিল তাঁদের দিকে। কানাইলাল, যতীন দাস, চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখের মৃত্যুপরবর্তী মিছিলই তার প্রমাণ। এইসব বিপ্লবীদের ফাঁসির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় মহাত্মা গান্ধীর অনাগ্রহ অনেকেই ভালো চোখে দেখেনি। ভগৎ সিংকে গান্ধীজী পরামর্শ দিয়েছিলেন, বিপ্লবের পথ একেবারে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বড়লাটের কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন জানাতে। ভগৎ সিং সেই পরামর্শ তুচ্ছ করে বড়লাটকে লিখেছিলেন, আমাদের ফাঁসি না দিয়ে, যুদ্ধবন্দীদের মতন গুলি করে মারুন। সেইসব মৃত্যুর দায়ভাগ এখনো রয়ে গেছে।

এখন আমাদের দেশে স্বদেশী সরকার। অবশ্য গরীব-দুর্বল দেশে কোনো স্বদেশী সরকার থাকে না, সেখানকার যে-কোনো সরকারই কোনো না কোনো বিদেশী শক্তির ক্রীড়নক। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, ভারত এখন ততটা গরীব বা দুর্বল দেশ আর নেই। স্বয়ংশাসিত হবার মতন যথেষ্ট শক্তি তার আছে। এই সরকার ঠাণ্ডা মাথায় এইসব যুবকদের কথা চিন্তা করুন। এরা হিংসার পথ নিয়েছিল। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার, যেসব দল অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী বলে ঘোষিত, খুন-জখমের রাজনীতিতে তারা কেউই গত পাঁচ-সাত বছর পেছুপা হননি। তাছাড়া ধর্মঘটে, মিছিলে, কল-কারখানায় দাবি আদায়ের লড়াইয়ে অনেকেই মরেছে, মেরেছে। রক্তের ছিটে আছে সকলেরই গায়ে। সুতরাং নতুন রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বিস্মরণ ও ক্ষমার নীতিই সুস্থ মনোভাবের পরিচায়ক হবে।

তথাকথিত উগ্রপন্থী বা নকশালপন্থীরাও কয়েকটি ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছেন

নিশ্চয়ই। শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল ব্যক্তিগত আক্রোশ। তাছাড়া ছোট ছেলের সামনে তার বাবাকে কিংবা নাতনীর সামনে দাদুকে বা ছাত্রীদের সামনে শিক্ষয়িত্রীকে হত্যা করতে গিয়ে তারা ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন কিছু মূল্য-বোধ। এসব কোনোদিনই সমর্থনযোগ্য নয়। যে-কোনো সমাজেই এইসব মূল্য-বোধের সম্মান আজো আছে। কিন্তু এসবের বিচার হয় নৈতিকভাবে। এদের প্রতি এখন বিচার বিভাগীয় প্রতিশোধ নেওয়া মানে দেশটাকে আরও পিছিয়ে দেওয়া। এদের মধ্যে রয়েছে বহু হীরের টুকরো ছেলে, যারা ব্যক্তিগত জীবনে, আমরা জানি, অত্যন্ত নম্র, দয়ালু এবং মেধাবী। দেশের প্রতি এদের এখনো অনেক কিছু দেওয়ার আছে।

সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে যদি বিচার করতেই হয়, সে বিচার হোক নিরপেক্ষ এবং অতি-ত্বরান্বিত। বিনা বিচারে বছরের পর বছর আটক রাখার বর্বর নীতির অবসান হোক এখনই। আমরা জানি, এঁদের অনেককেই আটক রাখা হয় চব্বিশ ঘণ্টা নির্জন সেলে। বিচারের আগেই এমন কঠিন শাস্তি যে কত মর্মান্তিক তা বিস্তার করে বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্তরীণ অবস্থার দিনলিপিতে জয়-প্রকাশ নারায়ণ লিখেছেন যে চব্বিশ ঘণ্টার একাকীত্বই তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি কষ্টকর ছিল। তিনি নিশ্চয়ই এই যুবকদের যাতনা বুঝবেন।

সমস্ত কবি ও লেখকদের পক্ষ থেকে আমরা দাবি জানাই, বিনা বিচারে, বিনা প্রমাণে বা মিথ্যে প্রমাণ সাজিয়ে যে সমস্ত হাজার হাজার যুবককে বন্দী করে রাখা হয়েছে, তাদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক।

ত্রিবৃত্ত পুরস্কার

কুচবিহার শহর থেকে 'ত্রিবৃত্ত' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা বেরোয়। পত্রিকাটি এমন কিছু বড় নয়, প্রকাশও খানিকটা অনিয়মিত এবং পেছনে কোনো বড় গোষ্ঠীও নেই। রণজিৎ দেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত এই পত্রিকাটি কলকাতায় অনেক পাঠক হয়তো চোখেও দেখেননি। তবু এঁরা এমন একটি কাজ করেন, যেটি সকলের গোচরে আনা দরকার বলে মনে করি। এঁরা প্রতি দু'বছর অন্তর কয়েকটি সাহিত্য-পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেন। সেই উপলক্ষে দু'দিন ধরে সাহিত্য অনুষ্ঠান এবং কবিতা পাঠ হয়। সেই উপলক্ষে যান পুরস্কৃত এবং নিমন্ত্রিত কিছু লেখক।

বাংলা ভাষায় প্রতি বৎসর কয়েকটি পুরস্কার দেন কয়েকটি বড় পত্রিকাগোষ্ঠী

এবং সরকার। বে-সরকারি, সম্পূর্ণ অব্যবসায়িক কোনো পত্রিকার পক্ষ থেকে সাহিত্য-পুরস্কার দানের কৃতিত্ব একমাত্র কুচবিহারের 'ত্রিবৃত্তে'র। এবং যে-হেতু সাহিত্যপ্রীতিই এঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাই এই পুরস্কারের সম্মান অনেক। এরা দেন একটি বাঁধানো তাম্রপত্র এবং সংবর্ধনা পত্র। লেখকদের কাছে পুরস্কারের আর্থিক মূল্যটাই অনেক সময় প্রধান হয়। সেটা স্বাভাবিকও, কিন্তু কুচবিহারের এঁদের আন্তরিকতার ছোঁয়া পেয়ে অভিভূত হয়ে যেতেই হয়। কত যত্ন করে এঁরা কলকাতা থেকে লেখকদের নিয়ে যান এবং পরমাত্মীয়ের মতন আতিথ্য দেন। এই সবকিছু সম্ভব হয় রণজিৎ দেব ও সমীর চট্টোপাধ্যায় নামে দুই যুবকের উদ্যমে এবং এঁদের অভিভাবক ও বন্ধু হয়ে আছেন স্থানীয় এক সাহিত্য-সঙ্গীতপ্রেমী মানুষ শ্রীহরিশ পাল এবং প্রেরণাস্বরূপ আছেন প্রখ্যাত লেখক শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদার।

এবৎসর উপন্যাস ও ছোটগল্পের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং সমীর রক্ষিত, তাঁদের পুরস্কৃত বই যথাক্রমে 'নয়নশ্যামা' ও 'বন্যার পর বাড়ি ফেরা'। কবিতার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন শংকর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পক্ষ থেকে সেই পুরস্কার ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হাত পেতে নিতে হয় আমাকে। গত বৎসর প্রায় এই সময়েই শংকর অকস্মাৎ সবাইকে ছেড়ে চলে যায়। শুধু একটু সান্ত্বনা এই, মৃত্যুর আগেই সে এই পুরস্কারের কথা জেনে গিয়েছিল।

এই কবিতা সংখ্যা

এই সংখ্যা কৃত্তিবাসে যত কবিতা ছাপা হলো, একসঙ্গে এত কবিতা এর আগে বাংলাভাষার কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়নি। বহু কবিতা-পাগলকে জড়ো করা গেছে একসঙ্গে। এছাড়াও অনেক কবিতা-পাগল বাইরে রয়ে গেলেন। বেশ কিছু মনোনীত কবিতা ছাপতে পারা গেল না স্থানাভাবে। আবার অনেক সম্মানিত, প্রতিষ্ঠিত কবির রচনা, আমাদের আন্তরিক অভিপ্রায় সত্ত্বেও সংগ্রহ করা গেল না শেষপর্যন্ত। কবিতাগুলি সাজানো হয়েছে যদৃচ্ছা। বয়েস বা খ্যাতির পারম্পর্যও রক্ষা করা যায়নি। এটা কৃত্তিবাসের স্বভাবের এলোমেলোমি। এজন্য সংশ্লিষ্ট কবিরা একদম রাগারাগি করতে পারবেন না। কিংবা রাগ করলেও একটু পরেই আবার ক্ষমা করুন, এই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

সুনীতিকুমার

৮৭ বৎসর বয়েসে পরিণত আয়ুতে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছে। তবু শোক এইজন্য যে তাঁর মস্তিষ্ক ও মেধা পূর্ণ সক্রিয় ও ধারালো ছিল, আমাদের সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে তিনি শেষ দিন পর্যন্ত সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে আমাদের আরো অনেক কিছু পাবার ছিল। রামায়ণ সম্পর্কে তিনি একটি বই লিখছিলেন, সেটা সমাপ্ত হলো না।

নাটক

আগে আমার নাটক দেখার অভ্যেস ছিল না। শিশিরকুমার ভাদুড়ী শেষ জীবনে ভাঙা মঞ্চে তাপ্পিমারা পোশাকে, পড়তি অভিনেতাদের নিয়ে কিছুদিনের জন্য দপ করে জ্বলে উঠেছিলেন, তারপর থেকে সাধারণ মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে অন্ধকার। অন্যদিকে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' থেকে শুরু হয়েছিল একটি নবনাট্য আন্দোলন, 'বহুরূপী' তাঁদের নাটকগুলিতে নিয়ে এলেন নয়নাভিরাম ও বুদ্ধি-উত্তেজক প্রকৃষ্ট শিল্প, আমরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সেগুলি অনুসরণ করছিলাম। তারপর হঠাৎ এক সময় থেকে অপেশাদার মঞ্চে শুরু হয়ে গেল এক দারুণ চ্যাঁচামেচি, যখন তখন জঙ্গী কথাবার্তা, কান ঝালাপালা হবার জোগাড়। সেইসব নাটকে অনেক সুমহান বক্তব্য আছে, কিন্তু কোনো শিল্প নেই। বিরক্ত হয়ে আমি নাটক দেখা বন্ধ করে দিলাম। দু'তিন ঘণ্টা ধরে কোনো কু-শিল্প দেখার চেয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়া আমার কাছে অনেক বেশি আনন্দের।

কয়েক বছর পরে নানা জনের মুখে শুনেছি বটে যে বাংলা অপেশাদার মঞ্চে আবার একটা নতুন জোয়ার এসেছে, কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করিনি। আর ঠকতে চাইনি। তারপর আমি আবার মঞ্চজগতকে ভালোবাসতে শুরু করলাম নান্দীকারের 'ভালোমানুষ' দেখে। মাত্র কয়েক বছরে বাংলা মঞ্চ যে এতখানি এগিয়ে গেছে, তা প্রথমে বিশ্বাসই হয় না। তারপর আমি নান্দীকারের পুরোনো-নতুন অনেকগুলি নাটক দেখে ফেলি এবং আরও বেশী মুগ্ধ হই।

আমাদের বাংলা ফিল্ম এখন জাহান্নমে যেতে বসেছে। চাক্ষুষ শিল্পের দিক থেকে নাটকও সেই পথ অনুসরণ করেনি, সেটা অত্যন্ত সুখের কথা।

গত দেড়মাসে আমি তিনটি নতুন নাটক দেখলাম। 'দানসাগর', 'জগন্নাথ' এবং

'মারীচ সংবাদ'। 'দানসাগর' নাটকটি ইদানীং বেশ খ্যাতি পেয়েছে। প্রেমচন্দের একটি ছোটগল্প অবলম্বনে একদল তরুণ এটি মঞ্চে নামিয়েছেন। প্রথম দৃশ্য থেকেই নাটকটি অভিনয় ও উপস্থাপনায় এমনই বিশ্বাসযোগ্য যে প্রায় দম বন্ধ করিয়ে রাখে। দুই ক্ষুধার্ত মিলে একটি মাত্র আলুসেদ্ধ খাওয়ার সিকোয়েন্সটি বহুকাল বাঁধিয়ে রাখার মতন। কিন্তু নাটকটির দ্বিতীয় অংশ মুগ্ধ করেনি। দারিদ্র্যের যত বীভৎস ছবিই দেখানো হোক, আমাদের দেশে তা সত্য। কিন্তু সেই দারিদ্র্যকেই বিপণন করে তোলা হলে, শিল্প অতটা ভার সয় না। হা-ঘরের মুখে বিশ্বরূপ দর্শনের ফিলজফি কানে লাগে।

'জগন্নাথ', আমার মতে, ইদানীংকালের শ্রেষ্ঠ নাটক। লু স্যুনের একটি ছোটগল্প এই নাটকের প্রেরণা। কিন্তু বোঝাই যায়, নাটকটির পরিকল্পনা থেকে প্রতিটি দৃশ্য-স্থাপনা ও সংলাপের কৃতিত্ব নাট্যকার অরুণ মুখোপাধ্যায়ের। জগন্নাথও এক নিপীড়িত মানুষের কাহিনী, কিন্তু হাস্যরস, সঙ্গীত ও করুণ রস এতে এমন চমৎকারভাবে মেশানো হয়েছে যে কোথাও জোড়গুলো বোঝা যায় না। আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে এর ন্যারেটিভ স্টাইল। এর কাহিনীটা একটানা নয়, আগের ঘটনা পরের ঘটনা মিলিয়ে মিশিয়ে তৈরি হয়েছে ছোট ছোট দৃশ্য, একজন লেখক এসে সেই দৃশ্যগুলো বর্ণনা করার পর সেগুলি যখন অভিনীত হতে দেখি, তখন তার মধ্যেও আসে অভাবনীয় চমক। এইসব দৃশ্যের মধ্যে আছে ঝকঝকে বুদ্ধির পরিচয়, শহুরে নাট্যকারের পক্ষে অতি-দরিদ্রের মুখে সংলাপ বসানোর জন্য যে বুদ্ধির প্রয়োজন খুব বেশী। এই নাটকে একটাই শুধু ত্রুটি, জমিদার, মহাজন, পুলিশ, ইনফরমার এদের কারুর মধ্যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না বলে, এরা হয়ে যায় টাইপ চরিত্র। আজকালকার সব নাটকেই এরা এক। তবে এই নাটকে জগন্নাথ চরিত্রের বৈচিত্র্য অন্য ত্রুটি চাপা দিয়ে দিয়েছে। নিজের হাতে একটি বেতের মোড়া তৈরি করার পর পথ দিয়ে জগন্নাথের হেঁটে যাওয়ার দৃশ্যটি ভুলতে পারি না।

'মারীচ সংবাদ' চেনা গোষ্ঠীর পুরোনো নাটক, সেজন্য এখন আর নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তবে, নাটকটির বিষয়বস্তু ও পরিকল্পনায় যে চমৎকারিত্ব আছে, তার যেন শেষ রক্ষা হয়নি মনে হয়। এই মৌলিক নাটকটি নিঃসন্দেহে অ-সাধারণ, কিন্তু এর মূল বক্তব্যটি মধ্যপথে শেষ হয়ে গেছে, তারপর কোথাও কোথাও লম্বা বক্তৃতা হাই তোলার সুযোগ দেয়। সেই তুলনায় 'জগন্নাথ' অনেক বেশী পরিণত।

পশ্চিম বাংলায় এই প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। তাঁদের আমরা স্বাগত জানাই। অন্তর্দলীয় কলহের জন্য এই রাজ্যে অনেকদিন সুষ্ঠু কোনো কাজ হয়নি। আশা করি, এই নতুন সরকার কিছু গঠনমূলক কাজে মন দেবেন।

আমরা আপাতত একটি বিষয়ের প্রতি এই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। শিক্ষা দফতরটি বহুদিন ধরেই বিপর্যস্ত অবস্থায় আছে। ছাত্রদের গিনিপিগ করে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে হরদম নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন আমাদের শিক্ষা-বিদরা। স্কুল ফাইন্যাল, উচ্চ-মাধ্যমিক, এগারো বারো, তিন বছরের বি-এ, দু বছরের বি-এ, ওয়ার্ক এডুকেশন ইত্যাদি কত রকম বদলাবদলি যে হলো এই ক'বছরে তার আর হিসেব রাখতে পারি না। এ বছরের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় তার পরের বছরে, ফলাফল বেরোয় আরও এক বছর পর, সেখানেও উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপে। এরপরও যদি গণ-টোকাটুকি বা পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়, তখন আমরা বয়স্কদের অকর্মণ্যতার কথা ভুলে গিয়ে কিশোর-তরুণদের কাঁধে সবরকম দোষ চাপাই। যাই হোক, সমস্যাটি ব্যাপক, এর সমাধানের চেষ্টা হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু আমাদের আজকের বক্তব্য অন্য বিষয়ে।

শিক্ষা দফতরেরই অধীনে সোশ্যাল এডুকেশন নামে একটি শাখা আছে। এই শাখার প্রকৃত কার্যকলাপ কী, সে সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি অবহিত নই, শুধু এইটুকু জানি, পশ্চিম বাংলার বহু গ্রন্থাগার এই বিভাগটির মুখাপেক্ষী। গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপনের একটি উদ্যোগ হয়েছিল গত বছরে। বহু গ্রামের সেইসব গ্রন্থাগার, আমরা নিজের চোখে দেখেছি, এখন শুধু নামেমাত্র টিঁকে আছে, কার্যত মৃত। চাঁদা দিয়ে লাইব্রেরীর সভ্য হয়ে বই পড়ার অভ্যেস এখনো আপামর জনসাধারণের মধ্যে চালু হয়নি। শুধু সভ্য-চাঁদাতেও কোনো গ্রন্থাগারের উন্নতি হতে পারে না। নতুন বই কেনা ও গ্রন্থাগারিক-নিয়োগের জন্য বাইরের সাহায্য প্রয়োজন। এককালে গ্রন্থাগারগুলি সমৃদ্ধ হতো জমিদারদের দানে। এখন সেই শ্রেণী অন্তর্হিত। দেশ এখন শ্রেষ্ঠী ও রাজনৈতিক নেতাদের করায়ত্ব, তাঁরা গ্রন্থাগার-বিমুখ। সরকারের সোশ্যাল এডুকেশন বিভাগ থেকে গ্রন্থাগারগুলিকে কিছু কিছু গ্রন্থ বিতরণের একটি ব্যবস্থা আছে। তা নিয়ে কতরকম কারচুপি যে হয়, তার ইয়ত্তা নেই। অফিসার ও কর্মীদের ধরাধরি, তোশামোদ ও বাঁ-হাতের ব্যাপার নিয়মিত চলে। কিছু প্রকাশক পাঁচ টাকার বইতে পনেরো টাকার লেবেল এঁটে

দেন, এবং সেগুলি অনায়াসে গৃহীত হয়। বোঝাই যায়, উভয়পক্ষেই কিছু বখরার ব্যাপার আছে। এর আগে রামমোহন ফাউণ্ডেশানের টাকায় বই কেনার ব্যাপারে যে কেলেংকারি হয়েছিল, সে সম্পর্কে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তখন দু' টাকার বই কেনা হয়েছে বাইশ টাকায় এবং কোনো প্রথম শ্রেণীর প্রকাশকের বই রামমোহন ফাউণ্ডেশান স্পর্শও করেননি। এ ব্যাপারে তদন্ত হওয়ার কথা ছিল তা ধামাচাপা পড়ে গেছে কিনা জানি না।

সোশ্যাল এডুকেশন বিভাগটির অনাচারের আমরা স্বয়ং ভুক্তভোগী। ঐ বিভাগ তাঁদের একটি সার্কুলারে তাঁদের বিভিন্ন জেলার লাইব্রেরিগুলির কাছে এই পত্রিকার নাম সুপারিশ করেন। সেই অনুযায়ী বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলায় প্রায় দু'শোটি লাইব্রেরিতে আমরা পত্রিকা পাঠিয়েছি নিয়মিত, সেখানকার পাঠকদের কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক চিঠিপত্রও পেয়েছি, কিন্তু এক কপি পত্রিকারও দাম পাইনি। তারপর বৎসরাধিক কাল ধরে আমরা চিঠিপত্র লিখেছি, কিন্তু অপর-পক্ষ নিঃশব্দ। সরকারের কাছ থেকে টাকা পেতে দেরি হয় এটা যেন একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু কত দেরি ? সেটা কেউ চিঠি লিখে জানাতে পারে না ? শিক্ষা দফতরে কি লেখা-পড়া জানা লোক কাজ করে না ? দশখানা চিঠি লিখেও যদি একটা উত্তর না পাওয়া যায়, তাহলে কি ধরে নিতে হবে না যে নিরক্ষর লোকেরাই ঐ বিভাগটি চালাচ্ছে ?

আশা করি এইসব কু-ব্যবস্থার অবসান হবে এখন।

গল্প সংখ্যা

গত বৎসরের মতন এবারেও কৃত্তিবাসের একটি সংখ্যা পুরোপুরি গল্প সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হলো। আমরা আমন্ত্রণ করে প্রতিষ্ঠিত বা খ্যাতিমান লেখকদের গল্প আনিনি। ডাক মারফৎ পাওয়া অধিকাংশ নতুন লেখকদের গল্পই স্থান পেয়েছে এ সংখ্যায়। কোনো কোনো লেখকের প্রথম গল্পটিও হয়তো এখানে ছাপা হলো।

লোড শেডিং-এর জ্বালায় আমরা ব্যতিব্যস্ত। কৃত্তিবাস কার্যালয়ে অধিকাংশ সন্ধেবেলাই অন্ধকার। বিপরীত দিকের বাড়ির ছাপা-মেশিনের শব্দ শোনা আমাদের নিয়মিত অভ্যেস, যা প্রায় হারমোনির মতন, ইদানীং তাও যখন তখন থেমে যায়। এই নিস্তব্ধতা বড় উৎকট। বিদ্যুতের খামখেয়ালিপনায় সারাদেশই পীড়িত, আমরা তার অধম শিকার। শারদীয় সংখ্যাটি আমাদের মনোমতন হলো না। অনিশ্চিত তাড়াহুড়োয় শেষ করতে হলো। কিছু প্রতিশ্রুত লেখা শেষ পর্যন্ত পাইনি, কিছু পেয়েও ছাপতে পারা গেল না। যেমন, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় অসুস্থ শরীরেও কষ্ট করে একটি গল্প লিখে দিয়েছিলেন কৃত্তিবাসের জন্য। আমি নিজেও একটি দৈত্য-কাহিনী লিখে রেখেছিলাম, এবং আরও কয়েকজনের চমৎকার লেখা. কিন্তু এগুলি সব দিতে গেলে ফুরিয়ে যেত শারদ অবকাশ। সব জমা রইলো পরবর্তী সংখ্যার জন্য। তবু, এই সংখ্যার বেশ কয়েকটি লেখার অভিনবত্ব নিশ্চয়ই পাঠকদের প্রীত করবে।

পথে ঘাটে আজকাল অনেকেই বলেন, কৃত্তিবাস আর আগের মতন হচ্ছে না, ঠিক কথা। আগামী ছ'মাস একটা নতুন প্রোগ্রাম নিয়েছি। দেখা যাক, অন্যরকম করা যায় কিনা!

তুষার

শংকর, যোগব্রত, বিমল রায়চৌধুরীর পর তুষার রায়ের অন্তিম প্রস্থান। আমাদেরই বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে। তবে তুষারের ঘটনা শুনে অতর্কিতে চমকে উঠিনি। তিন বছর আগে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে কৃত্তিবাস আয়োজিত সাহিত্য-সভায় কবিতা পড়তে উঠেছিল তুষার। তার নিজস্ব তেজী ধরনের কবিতা পাঠে তুষার একসময় মুক্তমেলায় হাজার হাজার মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু সেদিন, তুষার থেমে যাচ্ছিল বারবার, ভুলে যাচ্ছিল, কণ্ঠে কোনো জোর ছিল না, শক্তি, দীপক ও আমি তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলাম, যাতে হঠাৎ সে পড়ে না যায়। সেদিনই দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে আমি ভেবেছিলাম, এই বোধহয় তুষারের শেষ কবিতা পড়া। এরপর আর কোনো প্রকাশ্য সভায় তাকে দেখিনি।

তুষার মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করতো। কয়েকবার সে অসুখে পড়েছে, তার শুভানুধ্যায়ীরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেও, সে যেন তাদের সঙ্গে কৌতুক

করবার জন্যই নিজের প্রতি অবহেলা করেছে আরও। রাস্তার চলন্ত গাড়ির সামনে সে হঠাৎ-হঠাৎ ছুটে-ছুটে গেছে। কে জানে কেন এই লুকোচুরি তার এত প্রিয় ছিল! একাধিক কবিতার সে তো তার মৃত্যুর কথা ঘোষণা করে গেছেই, একটি কবিতায় সে লিখেছে, সে শুনতে পাচ্ছে তার চিতার কাঠ কাটার শব্দ।

তুষারের অনেকদিনের বন্ধু এবং কবি নিমাই চট্টোপাধ্যায় একটি স্মৃতি-নিবন্ধ লিখেছিলেন। স্থানাভাবে সেটিও দিতে পারলুম না এ-সংখ্যায়। শেষ চিহ্ন হিসেবে রইলো তুষারের দুটি কবিতা।

এই বৎসর ইকবালের জন্মশতবার্ষিকী। কৃত্তিবাসের বিশিষ্ট সুহৃদ কল্যাণ চৌধুরী একদিন আমাদের বললেন, পাকিস্তানে রবীন্দ্র-জয়ন্তী হয় না, কিন্তু আমরা কেন ইকবালের স্মরণে কিছু করবো না। এই প্রশ্নটি আমাদের সজাগ করে। আমাদের সীমিত সামর্থ্যে গত ৩০ সেপ্টেম্বর শেকস্পীয়র সরণীর এক প্রকোষ্ঠে একটি ছোটো সভার আয়োজন করছিলাম। প্রধান বক্তা ছিলেন ডঃ কৃষ্ণ চোপরা, যিনি লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন ইকবালের ছাত্র। তাঁর কথা শুনে আমরা বুঝতে পারলুম এই কবি সম্পর্কে আমরা খুব কম জানি, এবং কিছু ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছি। প্রকৃতপক্ষে ইকবাল দেশভাগ কিংবা পাকিস্তানের প্রবক্তা ছিলেন না। তিনি মুসলমান সমাজের উন্নতি চেয়েছিলেন এবং মনে-প্রাণে ছিলেন ভারতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী।

শারদীয় সংখ্যার পর এ-বৎসর আমাদের একটু গভীর ডুব হয়ে গেল। এই সংখ্যা বেরুলো দু'মাস বাদে এবং এটাকে আমরা কিছু অনিচ্ছাসত্ত্বেও যুগ্ম সংখ্যা হিসেবেই ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছি। এই দেরির কারণ কিছুটা আমাদের আলস্য, কিছুটা প্রেসের গোলযোগ। আগামী সংখ্যা থেকে, আশা করছি, কৃত্তিবাস আবার নিয়মিত হবে। দেখা যাক।

শারদীয় সংখ্যায় যে-সব প্রতিশ্রুত রচনা আমরা দিতে পারিনি, যার জন্য অনেক পাঠক আমাদের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন, সেগুলি দেওয়া হলো এ-সংখ্যায়। আগামী সংখ্যা থেকে আমরা নতুন পরিকল্পনায় কিছু-কিছু আলাদা-

রকমের রচনা প্রকাশের চেষ্টা করছি। এ-বৎসর যিনি কয়েকটি অত্যুজ্জ্বল ছোটো গল্প লিখেছেন, সেই মহাশ্বেতা দেবীর একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে আগামী সংখ্যায়। ভূমিহীন মজুরদের নিয়ে একটি রক্তমাংসের জীবন্ত কাহিনী লিখেছেন তিনি। পাঠকদের কাছ থেকে আমরা কৃত্তিবাসে প্রকাশিত রচনাগুলি সম্পর্কে সত্যবাদী সপ্রতিভ আলোচনা চাইছি। আগে অনেক পাঠক এরকম লিখতেন, এখন তাঁরা লাজুক হয়ে গেলেন কেন?

জ্ঞানপীঠ ও আকাদেমি পুরস্কার

লক্ষ টাকার জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রবর্তনের পর বারো বছরের মধ্যে তিনবারই পেলেন তিনজন বাঙালি লেখক-লেখিকা। এটা শ্লাঘার বিষয় নিশ্চিত। আশাপূর্ণা দেবী প্রথম নারী, যিনি এই পুরস্কার পেলেন। তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাই। যেসব তরুণ পাঠকরা তাঁর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসটি পড়েননি, তাঁরা বিলম্বের জন্য লজ্জিত না হয়ে সেটি এবার পড়ে নিন। সত্যিকারের ভালো বই।

এ বৎসর 'বাবরের প্রার্থনা' নামে কাব্যগ্রন্থের জন্য শঙ্খ ঘোষ যে আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন, সেটা আমাদের বিশেষ আনন্দের ব্যাপার। কৃত্তিবাসের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই শঙ্খ ঘোষ এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর 'এক দশকে সঙ্ঘ ভেঙে যায়' এই দুঃখিত পঙ্‌ক্তি ক্ষীণভাবে কৃত্তিবাসের উদ্দেশ্যেই। সঙ্ঘটি যে ভাঙবো ভাঙবো করেও শেষ পর্যন্ত একেবারে ভেঙে যায়নি সে-ব্যাপারে তাঁরও কিছু প্রচেষ্টা আছে, তিনি বহুসময়ে রচনা দিয়ে কৃত্তিবাসকে সাহায্য করেছেন। 'বাবরের প্রার্থনা'র কবিতাগুলি এই দশকের উজ্জ্বল উপহার। কৃত্তিবাসের সকলের পক্ষ থেকে শঙ্খ ঘোষকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

মণিমেখলা

এখন সমুদ্রের বুকে ভাসছে 'মণিমেখলা'। এটা একটা ছোটো পালতোলা নৌকো, বয়ে চলেছে সিংহল অভিমুখে। এটির কথা যখনই ভাবি, তখনই

আমার চিত্ত উদ্‌বেলিত হয়। সমুদ্রকে এফোঁড়-ওফোঁড় করা এখন আর মানুষের পক্ষে বিস্ময়কর কিছুই নয়, বস্তুত কোথাও কোনো সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে যে-মানুষটি প্রথম ভেবেছিল যে এই জলধি অসীম নয়, সেইদিনই মানুষ মর্ত্যসীমাকে জয় করেছে। প্রাচীন জল-পদবী আবিষ্কার ও পুনরায় অনুসরণে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন 'রা' ও 'কান্টিকি'র পরিচালক থর হায়ারডাল। 'মণিমেখলা'র সে-রকম কোনো বৃহৎ উদ্দেশ্য নেই, এর গন্তব্য সিংহল হলেও, একদা আমাদেরই ছেলে বিজয়সিংহ হেলায় লঙ্কা জয় করেছিল কিনা তার ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণের দায়ও নেননি এই নৌকোর অভিযাত্রীরা। শুধুই অভিযানের রোমাঞ্চের জন্য এঁদের যাত্রা।

আমরা এই কাণ্ডটির প্রতি অত্যন্ত বেশি আকৃষ্ট তার কারণ আমাদের বাংলা সাহিত্যের একজন এই 'মণিমেখলা'র কর্ণধার। ইনি 'কলকাতা' পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতির্ময় দত্ত। নানারকম বিপজ্জনক কাজে হঠাৎ-হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ার এক দুর্জয় প্রবণতা আছে এঁর। মেধার চর্চায় জ্যোতির্ময় যেমন অক্লান্ত, তেমনি তিনি নানা দুরন্ত কর্মেও জড়িয়ে পড়তে চান। তাঁর দু'-একটি কাজের নমুনা দিতে পারি। সমসাময়িক একজন কবি কিছুদিন মাথার সুস্থতা হারান। সেই সময় সেই কবি স্বভাবেও উগ্র হয়ে উঠেছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি অনেকের সহানুভূতি হারান এবং নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থানও রইলো না। বিনা চিকিৎসায় অনাহারে এবং লোকের উপেক্ষায় সেই কবি যখন এক প্রান্তসীমায় উপস্থিত, সেই সময় জ্যোতির্ময় সেই কবিকে নিয়ে যান নিজের বাড়িতে, এবং প্রায় মাতৃস্নেহে তাঁর সেবা করেছেন. দিনের পর দিন নয়, মাসের পর মাস। নিজের লেখা বন্ধ রেখে জ্যোতির্ময় সেই কবির কবিতা অনুবাদে ব্যাপৃত হয়ে রইলেন দীর্ঘদীন। এরকম দৃষ্টান্ত ইদানিং আমরা দেখিনি। আবার একসময় বহু মাস ধরে জ্যোতির্ময় ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় গঙ্গা তীরবর্তী একটি গ্রামে। নোনা জল ঢুকে সেখানকার চাষ নষ্ট হয়ে যায়, তাই জ্যোতির্ময় উদ্যম করেছিলেন একটি বাঁধ বাঁধবার। তিনি নিজের হাতে মাটি কেটেছেন। সেই গ্রামে এখন একটি স্থায়ী বাঁধ আছে।

জরুরি অবস্থার সময় তাঁর প্রতিবাদমূলক রচনা ও পুলিশী কোপ থেকে দীর্ঘ-কাল আত্মগোপনের ঘটনা এখন বহুল পরিচিত।

এবার তিনি ভেসে পড়েছেন দরিয়ায়। আমরা দিনের পর দিন টেবিল-চেয়ারে বা শয্যায় দিন কাটাচ্ছি, সেই সময় জ্যোতির্ময় সমুদ্রের ওপর নৌকোর

দাঁড় টেনে চলেছেন। বঙ্গোপসাগরের চরিত্র অত্যন্ত গোলমেলে, এই সেদিন কয়েকটি মাত্র প্রবল ঢেউ অন্ধ্রে আছড়ে পড়ে বহু হাজার মানুষের প্রাণ নিয়ে গেল। জ্যোতির্ময় এইসব বিপদের মুখোমুখি যেতেই ভালোবাসেন। তিনি যেন এক জীবনেই দশ-বারোটি জীবন কাটিয়ে যেতে চান।

জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে ঐ নৌকোয় আছেন শেখ আজিজুর রহমান নামে এক লাজুক তরুণ এবং মায়া সিদ্ধান্ত নামে এক মৃদুভাষিণী তরুণী। নৌকো চালনার কাজে এঁরা দু'জনেই অনভিজ্ঞ। আমরা এই দু'জনেরও দুঃসাহসিকতায় মুগ্ধ। 'মণিমেখলা'র যাত্রা শুধু সিংহলে নয়, আমাদের মনের মধ্যে আরো অনেক দূরে। এই যাত্রা সফল হোক।

বিজন ভট্টাচার্য

আধুনিক গ্রুপ থিয়েটারের পথিকৃৎ বিজন ভট্টাচার্যের মৃত্যু একটি ইন্দ্রপতন। নাটক রচনায়, পরিচালনায় ও অভিনয়ে তিনি যুদ্ধ-পরবর্তীকাল থেকে আমৃত্যু বিশিষ্ট। শিল্পজগতে এক একজন মানুষ থাকেন, যাদের কিছুতেই মেলানো যায় না অন্যদের সঙ্গে। তাঁরা সব সময়ই গ্রুপ ফটোগ্রাফ থেকে একটু আলাদা হয়ে থাকেন। বিজন ভট্টাচার্য ছিলেন সেরকম একজন মানুষ। সংগীত জগতে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রও ছিলেন এই রকম একজন। এইসব মানুষ একে একে চলে যাচ্ছেন, আশংকা হয় ভবিষ্যতে এঁদের শূন্যস্থান পূরণ হবে কিনা।

মাসিক পত্রিকা হিসাবে এটাই কৃত্তিবাসের শেষ সংখ্যা। সুখে-দুঃখে সুদীর্ঘ কালের যাত্রার এখানেই সমাপ্তি। এই সংখ্যাতেই কৃত্তিবাসের পঁচিশ বছর বয়েস পূর্ণ হলো।

কৃত্তিবাস বন্ধ করে দেবার কারণগুলি পর্যায়ক্রমে এই : সম্পাদকের ব্যর্থতা, অতিরিক্ত ব্যয়ভার, বিজ্ঞাপন সংগ্রহের উঞ্ছবৃত্তিতে আমাদের অক্ষমতা, বিদ্যুৎ ঘাটতিতে প্রেসের দুর্দশা এবং কৃত্তিবাসকে কৃত্তিবাস হিসেবেই মরতে দেবার বাসনা।

বাংলা সাহিত্যে কৃত্তিবাসের স্থান সম্পর্কে আমাদের কোনো লম্বাচওড়া দাবি নেই। বাংলা সাহিত্যের যদি খানিকটা সেবাও কৃত্তিবাস করে থাকে, তবে সেটুকুই যথেষ্ট মনে করি। আমরা কখনো নিন্দামন্দের প্রশ্রয় দিইনি, সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ওপরেই এ-পত্রিকার বরাবরের ঝোঁক ছিল। দলমত নির্বিশেষে বাংলা ভাষার সমস্ত লেখকের প্রতিই ছিল কৃত্তিবাসের আহ্বান। এবং কৃত্তিবাস সব সময়ই সমসাময়িক থাকতে চেয়েছে। তরুণ লেখকদের জন্য ছিল কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠা উন্মুক্ত। নবপর্যায় মাসিক কৃত্তিবাসেও নবীন লেখকরাই প্রাধান্য পেয়েছেন।

দুর্মর মায়াবশত আমরা কৃত্তিবাসকে পুরোপুরি হত্যা না-করে হয়তো আবার উজ্জীবিত করতেও পারি, ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে। কিন্তু সেটা এখনো সম্ভাবনার পর্যায়েই রইলো।

বিভিন্ন সময়ে যাঁরা কৃত্তিবাসকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

কৃত্তিবাসের এই তৃতীয় পর্ব শুরু হলো। জানি না এর পথ বা আয়ু কতখানি। দুর্মর মায়ার টানেই এরকম একটি পত্রিকা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব, নইলে ইদানিং এ-কাজে পদে-পদে মনোবেদনা। আমাদের কার্যালয় সন্ধের দিকেই খোলা থাকে, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কাজ সেরে আমরা সেখানে সমবেত হই, এবং প্রায় অবধারিত ভাবে প্রতিদিনই বিদ্যুৎ অন্তর্হিত। রচনা ও প্রুফ পাঠ করতে হয় মোম জেলে, তখন ঘরের সব জানালা বন্ধ করে দিতে হয়, কেননা দমকা বাতাসে মোমের শিখা টেঁকে না, অর্থাৎ অসহ্য গরম শরীরে জ্বালা ধরায়। তবু রামমোহন বিদ্যাসাগরের আমলে তাঁরা সেজবাতি জেলে লেখাপড়া করেছেন এবং তাঁরা বৈদ্যুতিক পাখা পাননি, এই ভেবে যদিবা সান্ত্বনা পাওয়া যায়, কিন্তু তৎকালীন পা-চালিত ছাপা যন্ত্র এখন আর কিছুতেই পাওয়া সম্ভব নয়, এখনকার ছাপাখানা পুরোপুরিই বিদ্যুৎনির্ভর। সুতরাং পত্রিকা প্রকাশের নির্দিষ্ট সময়সীমা রক্ষা করা একপ্রকার অসম্ভব হয়েই দাঁড়িয়েছে।

তার ওপর এল এবারের অস্বাভাবিক বন্যা। এই বন্যা শুধু বিস্তৃতি বা

ভয়াবহতার জন্যই অভূতপূর্ব নয়, এর চরিত্রও অদৃষ্টপূর্ব। কে কবে শুনেছে যে একই বছরে একই এলাকায় বারবার বন্যা হয়? আমরা নদীগুলিকে বেঁধেছি বন্যা রুখবার জন্য, আবার সেই বাঁধকে রক্ষা করবার কারণে জল ছেড়ে দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে নিরাশ্রয় করে দিতে হয়। এবারের বন্যায় শুধু গ্রাম নয়, নবদ্বীপ, বর্ধমান, সিউড়ির মতন মজবুত শহরগুলিও ডুবেছে। সাধারণত বন্যা হয় গ্রামে, শহরের লোক সাংস্কৃতিক উৎসব করে চাঁদা তোলে। এবার কলকাতা শহরও তিনদিনের বৃষ্টিতে আধ-মরা হয়েছিল। নিছক বৃষ্টি-জমা জলকেই বন্যার দৃশ্য বলে ভ্রম হয়, অনেকের দুর্ভোগ বন্যার্তদেরই মতন। কলকাতার এই বন্যার মহড়ায় আমি প্রীত হয়েছি, আমার খুব বাসনা, এই শহরে একবার সত্যিকারের বিধ্বংসী বন্যা আসুক, তাতে ডুবে যাক রাইটার্স বিল্ডিংস ও পনেরো-কুড়িতলা সব বাড়িগুলি পর্যন্ত। তারপর দেখা যাক, প্রলয়পয়োধিজল থেকে বেদ উদ্ধারের মতন, সেই প্লাবনের পর এই শহরে কেউ নতুন করে সত্যিকারের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারে কিনা।

কৃত্তিবাসের প্রকাশ খুবই অনিয়মিত হয়ে পড়ায় আমাদের চরিত্রে নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। আমরা ঠিক করেছিলুম স্থিতধী হবো। যেহেতু প্রতি-মাসে আর বের করা যাচ্ছে না, তাই নিছক গল্প-কবিতা-উপন্যাসের মিশ্রিত সংকলন প্রকাশেরও আর যুক্তি দেখি না। প্রতিটি সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট পরি-কল্পনায় সাজিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলুম। সেই হিসেবে, এবারে প্রবন্ধ-সংখ্যা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, প্রবন্ধের দিকেই আমরা সবচেয়ে কাঁচা। অথবা এমনভাবেও বলা যায়, বাংলায় প্রবন্ধ-লেখকরাই সবচেয়ে অলস। আমরা অনেকের কাছেই প্রবন্ধ চেয়েছিলুম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পেরেছি যৎসামান্য, অবশ্য আমাদের দীর্ঘদিনের নীরবতা এবং শেষমুহূর্তের তাড়াহুড়োও এজন্য কিছুটা দায়ী।

কলকাতার বইমেলার সঙ্গে সংগতি রেখে আমাদের এই সংখ্যায় বিভিন্ন গ্রন্থ-বিষয়ক রচনা রাখাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রবন্ধে বিষয়বস্তু বিস্তৃত হয়ে

গেছে, তার ফলে, মনে হয় পাঠযোগ্যতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সংখ্যাটি, আয়তনে কৃশ হলেও, সম্পাদক হিসেবে আমি বলবোই যে বেশ ধীরেসুস্থে পড়তে হবে, রেখে দিতে হবে, পরে আবার পাতা উল্টে দেখতে হবে।

আগামী বৎসর বইমেলার সময় আমরা আরও চমৎকার ও সমৃদ্ধতর একটি প্রবন্ধ-সংখ্যা উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। অবশ্য কৃত্তিবাস সমেত যদি আমরা বেঁচে থাকি।

ফিনিক্স পাখির উপমা যদি বেশি বাড়াবাড়ি মনে না হয়, তাহলে বলা যায় যে এ-পাখির মতনই কৃত্তিবাস পত্রিকা বারবার মরে এবং বাঁচে! হয়তো, কিংবা প্রকৃতপক্ষেই এই পত্রিকা আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। কৃত্তিবাস বন্ধ থাকলে আমাদের আহারে-বিহারে কিছুটা যেন ফাঁক থেকে যায়। ঠিক এক বছর নিঃশব্দ থাকার পর হঠাৎই একদিন আমরা আবার কৃত্তিবাস প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন লোডশেডিং কিছু কম ছিল এবং আমরা ভুল আশা করি যে এবার বিদ্যুতের সু-সময় আসবে। কিন্তু অচিরেই, কাজ শুরু করার সঙ্গে-সঙ্গে বিপুল-ভাবে অসময়ের অন্ধকার সবকিছু বিপর্যস্ত করে দেয়। সেইজন্য এ-সংখ্যায় আমরা বিশেষ কোনো পরিকল্পনা অনুসরণ করতে পারিনি। এমনিতেই সময়ের অভাব ছিল, আলোর অভাব সময় আরও অনেক কমিয়ে দেয়, সুতরাং আমাদের অন্যমনস্কতা, ভ্রান্তির সঙ্গে কিছু বিশৃঙ্খলার ছাপও এই সংখ্যায় পড়েছে। আমা-দের ইচ্ছে ছিল পরিণত, পরিচিত লেখকদের সঙ্গে-সঙ্গে কিছু-কিছু নতুন লেখকের নতুন রকমের রচনা পাশাপাশি রাখা। তেমনভাবে সকলের কাছ থেকে রচনা সংগ্রহ করা হয়ে ওঠেনি, অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। যাই হোক, একটা কিছু হলো।

ভবিষ্যৎ-কৃত্তিবাস সম্পর্কে আমাদের কোনো ঘোষণা নেই। ইচ্ছে আছে, ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশ করে যাওয়া, সম্ভব হবে কিনা জানি না।

পদতলে স্থান বলেই কবিতার আর এক নাম পদ্য, এক-সময় ইয়ার্কি করে এরকম বলা হতো। কৃত্তিবাস পত্রিকায় কখনো গদ্যরচনার নীচে কবিতা দিয়ে

পাদপূরণের অপচেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু এ-সংখ্যায় দু'টি গুরুতর ভুল হয়েছে, এজন্য আনন্দ বাগচী এবং সুরজিৎ ঘোষের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। হামদি বে'র মাতৃভাষা উর্দু। তিনি ইংরেজি ভাষায় বিখ্যাত সাংবাদিক, তাঁর ইংরেজি গল্পটির অনুবাদ করেছেন মীনাক্ষী দত্ত, সেই নামটি বাদ গেছে। লেখাগুলি সাজানো হয়েছে নিছকই ছাপাখানার জরুরি সুবিধের জন্য, আশা করি কৃত্তি-বাসের লেখক-লেখিকারা সেজন্য কিছু মনে করবেন না।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে আবার কৃত্তিবাস প্রকাশিত হলো। আমরা আগুনে ঝাঁপ দেওয়া মৃত্যুত্তীর্ণ পাখির সঙ্গে এর তুলনা দিয়েছিলাম।

এই সংখ্যাটি কমলকুমার মজুমদারের স্মরণে নিবেদিত। তাঁর অকালমৃত্যুর পর কবি সুব্রত চক্রবর্তী কমলকুমারের অপ্রকাশিত রচনা সংগ্রহ করেছিলেন সযত্নে। অকস্মাৎ সেই তরুণবয়স্ক সুব্রতকেও হরণ করে নিয়ে গেল কাল। নব পর্যায় কৃত্তিবাসের সঙ্গে সুব্রত যুক্ত ছিলেন প্রথম থেকেই। তিনি আমাদের আত্মার একটি টুকরো নিয়ে চলে গেছেন।

সুব্রত চক্রবর্তীর সংগ্রহ থেকে কমলকুমারের কিছু অপ্রকাশিত লেখা আমাদের জন্য সম্পাদনা করে দিয়েছেন শ্রীপ্রশান্ত মাজী। অবশ্য এইসব রচনা ও স্কেচ আমরা ব্যবহার করতে পেরেছি কমলকুমারের স্ত্রী দয়াময়ী মজুমদারের সৌজন্যেই। এবং আরও সুখের কথা, দয়াময়ী দেবী নিজের হাতে লিখে দিয়েছেন তাঁদের উভয়ের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী।

অনেক পত্রপত্রিকাতে ছড়িয়ে আছে কমলকুমারের অনেক বিস্ময়কর রচনা। আমি কিছুদিন অধুনালুপ্ত জনসেবক পত্রিকার রবিবাসরীয় পৃষ্ঠার সম্পাদক ছিলাম, তখন কমলকুমার সেখানে প্রতি সপ্তাহে সাহিত্য-বিষয়ক ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লিখতেন 'রোজনামা' নামে। ঠিক ঐ ধরনের লেখা তিনি আগে বা পরে আর লেখেননি। অনেক পরিশ্রমে পুরোনো ফাইল ঘেঁটে সেই সবকিছু লেখা উদ্ধার করে দিয়েছেন শ্রীসুব্রত রুদ্র। এছাড়া আছে 'সুন্দরম' পত্রিকা থেকেও একটি রচনা। এবং হঠাৎ পাওয়া চিত্রনাট্য।

এর মধ্যে আরও অনেক লেখক-শিল্পী আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। শেষ দিকে এই পত্রিকার সঙ্গে লেখক হিসেবে অনেকখানি যুক্ত হয়েছিলেন বিনয় ঘোষ। তাঁর কাছ থেকে আমরা আরও অনেক কিছু পাবার আশা করেছিলাম। আর শিবরাম চক্রবর্তী তো আমাদের সকলেরই আবাল্য সুহৃদ।

এবারের এই সংখ্যায় পাঠকরা হয়তো কিছু-কিছু ব্যস্ততার অযত্নের চিহ্ন দেখতে পাবেন। প্রকৃতপক্ষেই খুব তাড়াহুড়ো করতে হয়েছে, তাছাড়া অন্যান্য অসুবিধে তো রয়েছেই। অনেক লেখা চেয়ে নিয়েও আমরা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করতে পারিনি, কৃত্তিবাসের অনেক নিয়মিত লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি, তাঁদের সকলের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

কৃত্তিবাসের পরবর্তী সংখ্যা যে আবার জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বেরুবেই, তাতে আর কোনোই সন্দেহ নেই।

গত বইমেলার সময় কৃত্তিবাসের যে সংখ্যাটি প্রকাশিত হবার কথা ছিল, সেই সংখ্যাটিই এতদিনে বার হলো। অর্থাৎ যার দেখা পাবার কথা ছিল ফাল্গুনে, সে এল বৈশাখের শেষে। দেরির নানা কারণ ও কৈফিয়ৎ বারবার উল্লেখ করার আর প্রয়োজন দেখি না। এই সংখ্যাটি আকারে ক্ষুদ্র না-হলেও সূচিপত্র অতি সংক্ষিপ্ত, একটি প্রবন্ধ ও একটি উপন্যাস। অশোক রুদ্র মশাইয়ের উপন্যাসটির টাইপ করা পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে ছিল, সেটি ছাপা কত পৃষ্ঠা হবে আগে থেকে সঠিক আন্দাজ করতে পারিনি, এ-বিষয়ে আমাদের ছাপা-খানার কর্ণধার গনেশদা'র কাছে আমি এবার হেরে গেছি। কিন্তু উপন্যাসটি যে-রকম তাতে সেটি সমগ্রভাবে এক সংখ্যাতেই ছাপা যুক্তিযুক্ত, এরকম আমার মনে হয়েছে। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে, বছর দু'-এক আগে মহাশ্বেতা দেবীর 'অপারেশন : বসাই টুডু' নামে একটি উপন্যাস দিয়েই প্রকাশিত হয়েছিল কৃত্তিবাসের আলাদা একটি সংখ্যা। বিষয়-গুণ, রচনা-সৌষ্ঠব এবং সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের এই উপন্যাসটিও পাঠকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করবে, এমন আশা করি।

মাতৃদুগ্ধ

বিতর্ক ও কোলাহল অনেকটা স্তিমিত হয়ে এলেও এখনো দেয়ালে দেয়ালে জ্বলজ্বলে অক্ষরে উৎকীর্ণ দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের এই বাক্য, "শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ"। দেখলেই কৌতুক ও হর্ষ জাগে। শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা, সে-বিষয়ে পৃথিবীর কোনো দেশে কোনোরকম মতভেদ থাকতে পারে? থাকলে তা কৌতুকের বিষয় হবেই। আসলে মতভেদ নেই। তবু ক'দিন আগে পশ্চিম-বাংলায় একটা তুমুল আলোড়ন হয়ে গেল। দু'পক্ষেই অনেক ভারী ভারী পণ্ডিত ও শিক্ষা-নিয়ামকগণ, এবং তাঁরা যে শুধু সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে, প্রকাশ্যে বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন তা নয়, পথেও বসেছেন। প্রসঙ্গ যদিও শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে সম্পূর্ণ ইংরেজি-বর্জন, তবু দু'পক্ষের মধ্যে কে কত বেশি মাতৃভাষা-ভক্ত, তা নিয়ে তর্জন-গর্জনই শোনা গেল বেশি। দেশবরেণ্য, শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ্‌গণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে অনেক জল ঘোলা করেছেন, অনেক কটুকাটব্যও উচ্চারিত হয়েছে, বড়োই দুঃখের কথা!

এ-বিষয়ে আমরা আমাদের সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ করতে চাই। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার চান শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি একেবারে তুলে দিতে। আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই নীতির সমর্থক। পশ্চিমবাংলার সমস্ত স্কুলে অবিলম্বে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি পড়ানো একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হোক। এটা সর্বভারতীয় শিক্ষানীতিও বটে। সমস্ত শিশুই শিক্ষা শুরু করবে মাতৃভাষায়। এর সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের বাণী, গীতা বা কোরাণের আপ্তবাক্য, চীন-জাপান-রাশিয়া-আমেরিকা কোনো দেশের শিক্ষাবিদ্‌দের সাক্ষ্য দরকার নেই। প্রাথমিক স্কুলের ইংরেজি শিক্ষকরাও এখন থেকে নবোদ্যমে বাচ্চাদের শুধু মাতৃভাষাই শেখাবেন।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও, স্নাতক পর্যায়েও ভাষা বা সাহিত্যকে অপ্রয়োজনীয় বা অনাবশ্যক করারও কী-যেন একটা প্রস্তাব উঠেছে। সেটা আমরা এখনো ভালোরকম বুঝিনি। 'ঐচ্ছিক বাধ্যতামূলক'—এরকম একটা নাকি শর্ত জোড়া হচ্ছে। এ-বিষয়ে পরে চিন্তা করা যাবে। একটা কথা অনেকেই বলেন যে, যাঁরা মাতৃভাষার সমর্থক ও ইংরেজি-হঠানোর প্রবক্তা, সেইরকম অনেক মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ্, শিক্ষা-অধিকর্তারা কিন্তু নিজেদের সন্তানদের ঠিকই ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলে পাঠান এবং সে-কথা গোপন করে যান। সেরকম ভণ্ডামির অভিযোগে

যাতে না-পড়তে হয়, সেইজন্য এখানে একটি ব্যক্তিগত কথা বলতে হচ্ছে। বর্তমান সম্পাদকের একমাত্র সন্তানও ঐরকম একটি ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলের ছাত্র। ঐসব স্কুলে দুগ্ধপোষ্য শিশুরা অ-আ ক-খ'র আগে এ বি সি ডি শেখে। ঐসব স্কুলের উঁচুশ্রেণীর ছাত্ররা শতকরা আটানব্বই জন, আবার বলছি শতকরা আটানব্বই জনই একটানা দু' মিনিট শুদ্ধভাবে মাতৃভাষায় কথা বলতে পারে না, মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবারও কোনো ব্যবস্থা সেখানে নেই। এমনই অশিক্ষা ও কুশিক্ষা সেখানে চলে। আমি মনে করি, যীশু-সেবকগণ পরিচালিত ঐসব বিদ্যালয়গুলিকেও কোনোরকম বিশেষ সুবিধে দেওয়া অযৌক্তিক ও অনৈতিক, ঐসব জায়গাতেও পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি পড়ানো এখুনি বন্ধ করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

এবার দুধের কথা।

মাতৃভাষা তো হলো মাতৃদুগ্ধ, তাহলে ইংরেজি গুঁড়ো দুধ বা বোতলের দুধ। গ্রামের হাজার প্রাথমিক স্কুলে এখন বাংলা বা ইংরেজি কোনোটাই ঠিক রকম পড়ানো হয় না, ইংরেজি তুলে দিলে আশা করি বাংলাটা তবু কিছু মনোযোগ দিয়ে পড়ানো হবে। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত, দশ-বারো বছরের ছেলেমেয়েরা তো শুধু মায়ের দুধ খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। আর এদেশের অভাগিণী জননীদের বুকে তত দুধই বা কোথায়? সুতরাং ইংরেজি হঠে যাক, তার বদলে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা দুধেরও ব্যবস্থা হোক। আশা করি এ-বিষয়ে সরকার-পক্ষীয় বা বিপক্ষীয় পণ্ডিতগণ একমত হতে পারবেন।

ইহজীবনে আমি কোনো বছর সেপ্টেম্বর মাসে এত রোগা নদী দেখিনি। শরতের আকাশ যখন সাদা-মেশানো নীলিম হতে শুরু করে, সেই সময় সবুজ ঢেউ-খেলানো প্রান্তর দেখাই আমাদের বঙ্গবাসীদের অভ্যেস। এবারে চতুর্দিকেই দেখি বিবর্ণতা, ধানগাছগুলি সাবালক হলো না। কত বছরের মধ্যে এমন খরা আবার এল, তার হিসেব শস্য-তাত্ত্বিকেরা করবেন, আমি তো এমন ভয়াবহ শুষ্কতা আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এবারে কাশফুল প্রায় অদৃশ্য,

শিউলিও অনেক কম। প্রকৃতি কেন এমন দেশান্তরী হলো ?

আমরা শহরবাসী, আমরা অনেকখানি সুবিধাভোগী। একালের সভ্যতা শত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মধ্যেও নগরগুলিকে ঠিক টিঁকিয়ে রাখে, কোনোক্রমে স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। এই শহর ঘিরে আছে শত শত গ্রাম, তা এখান থেকে সেখান থেকে উজাড় হয়ে যায়। বাঁধের ওপরে বসে থাকা বিষণ্ন মানুষদের আমরা দেখেছি, এবং তা স্বাভাবিক বছরেই। এ-বছর তারা কোন্ আশায় আগামী বছরের কথা চিন্তা করবে ?

আমাদের দু'জন অত্যন্ত কাছের মানুষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও নীরদ মজুমদার চলে গেলেন। সাহিত্য ও শিল্পের জন্য এঁরা দু'জনেই আয়ু নিবেদন করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রায়ই বলতেন, লিখতে আমি ভালোবাসি, আমি যত্ন করে লিখতে চাই। তাঁর এই কথা এবং তার লেখাগুলি পরবর্তীকালের তরুণদেরও প্রেরণা জোগাবে। আর নীরদ মজুমদার ভারত-প্রসিদ্ধ শিল্পী, দীর্ঘকাল প্রবাসে থেকেও তিনি ভারতীয় ভাবরীতিকেই মূর্ত ও বিমূর্ত করেছেন। তিনি ছিলেন সাহিত্যপ্রেমী, কমলকুমারের এই অনুজ মজলিশী সাহিত্য-আড্ডাতেও ছিলেন অসাধারণ। এইসব মানুষ দেশের এক-একটি স্তম্ভস্বরূপ।

প্রথম পর্যায়

কৃত্তিবাস বাংলাদেশের তরুণতম কবিদের মুখপত্র। একেবারে তরুণদের সার্থক না-হলেও ভালো নতুন কবিতার গতিপথের একটা নিরিখ যাতে পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে তাঁদের কবিতা এতে একত্র করা হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাঁরা তো বিভিন্ন কাগজে লিখছেনই এবং যদি তাঁদের স্বকীয়তা থাকে তবে নিজেদের দীপ্তিতে তাঁরা তো মনোযোগ আকর্ষণ করবেনই, সুতরাং পৃথক কাগজের কী প্রয়োজন? তার উত্তর, অনেককে এক জায়গায় দেখলে নতুন কবিতার চেহারাটা সম্পূর্ণাঙ্গ হয়ে চোখে পড়ে। তা ছাড়া, আসল কথা হলো তরুণদের একটি গোষ্ঠি বা দল গড়ে ওঠা। আমাদের ধারণায় এই দল, যা ইতিপূর্বে কোনো-কোনো পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এবং যা থেকে একাধিক শক্তিমান দক্ষ কবিকে আমরা পেয়েছি, তার একান্ত প্রয়োজন। এই দলে, সম্মিলিত আড্ডায়, কবিদের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং পারস্পরিক বন্ধুত্ব যত দৃঢ় হয় লেখায় আত্মস্বতন্ত্রতা তত বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন তরুণদের বিক্ষিপ্ত কাব্য-প্রচেষ্টাকে সংহত করলে—বাংলা কবিতায় প্রাণছন্দের উত্তাপ নতুন আবেগে এবং বলিষ্ঠতায় লাগতে পারে এবং সকলের মধ্যে প্রত্যেকের কণ্ঠস্বরকেই আলাদা করে চেনা যেতে পারে।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে পাকিস্তানের কবিদের স্থান প্রায় অনুল্লেখ্য। তাতে কোনো দুঃখ থাকতো না—যদি-না তাদের কেউ-কেউ আশ্চর্য সার্থক কবিতাও লিখতেন। বাংলাদেশের শারীরিক মানচিত্রের মতোই কাব্যের মানচিত্রও খণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু উভয় বঙ্গে বাংলা ভাষার পূর্ণ অধিকার সম্বন্ধে যেন আমাদের কখনও-না সন্দিগ্ধ হতে হয়। পাকিস্তানের তরুণ কবিরা আমাদের সমদলীয়, সহকর্মীও। এ-সংখ্যায় তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভবপর হলো না কিন্তু আগামী সংখ্যায় আমরা নিশ্চয়ই সক্ষম হবো।

আগামী সংখ্যা থেকে পত্র সংখ্যা বাড়ানো চলবে কিনা তা নির্ভর করছে কৃত্তিবাসের শুভাকাঙ্খীদেরও সংখ্যার ওপর। সমস্ত সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাকে 'কৃত্তিবাসে'র বার্ষিক গ্রাহক হবার জন্য আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনাদের সহযোগিতাতেই কৃত্তিবাস কল্পতরু হবার আকাঙ্ক্ষা রাখে।

কাব্যসভা

রবীন্দ্রনাথ থেকে যে আধুনিক বাংলা কবিতার সৃষ্টি তার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিতর্ক-বিচার এবং গতিপথের মূল্য নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত নেই। তবুও প্রথম দিককার কবিতায়, কিছুটা অসংস্কৃত হলেও আত্মপ্রত্যয়ের সুর ছিল। এখনকার কবিতা যেন বেশিমাত্রায় ভঙ্গিপ্রধান এবং বক্তব্যে অনিশ্চয়তার সমস্যা। এ-ছাড়া দলগত সমস্যাও কম অপ্রধান নয়। কবিতার এই-সব সমস্যা কবি এবং কবিতা-পাঠক উভয়কেই নাড়া দেয়। কবিতার মাধ্যম ছাড়াও হয়তো কবিতার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে কবির কিছু বক্তব্য থাকে—যা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দুটি-একটি প্রবন্ধে কিছুই স্পষ্টিকৃত হয় না।

কবিতার বহুতর সমস্যার আলোচনা, নতুনতর বক্তব্য, বিশেষ বিষয় বিশ্লেষণ এবং কবি ও পাঠকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের জন্যই কাব্যসভা করার প্রচেষ্টা। মাঝে মাঝে, বছরে অন্তত চারবার, এই রকম কাব্যসভা করলে হয়তো কবি, কবিতা এবং রসগ্রাহীর সম্পর্ক অধিকতর সরল হয় এবং আত্মকেন্দ্রিক কবিকে চোখ খুলে তাকাতে সহায়তা করা হয়। এই কাব্যসভায় বিভিন্ন প্রবীণ এবং নবীন কবিদের আমন্ত্রণ করা হবে এবং কবিতার বিভিন্ন অঙ্গের উপর তাঁদের নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশ করতে অনুরোধ করা হবে। পুরনো কবিতা এবং একেবারে নতুন কবিতাও এখানে আবৃত্তি করা এবং পড়া হবে। বলা বাহুল্য, এই সভা বিশুদ্ধ কাব্যেরই সভা।

এই কাব্যসভাকে কার্যকরী করে তুলতে একটি দলের প্রয়োজন। কলকাতার বিভিন্ন কলেজ এবং য়ুনিভারসিটি থেকে কবিতা যাঁরা ভালবাসেন তাদের নিয়ে একটা সক্রিয় কমিটি গঠন করা হবে।

কাব্যসভার প্রথম সভা হয় স্কটিশচার্চ কলেজের সাংস্কৃতিক প্রাচীরপত্র "ভাষণের" উদ্যোগে স্কটিশচার্চ কলেজ হলে, মার্চ মাসে। এই অনাড়ম্বর অন্তরঙ্গ সভাটিতে কবিদের মধ্যে আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন অজিত দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, মণীন্দ্র রায়, নরেশ গুহ এবং রাম বসু। আলোচনার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ছিল—বাংলা কবিতায় বসন্ত, নতুন কবিতায় চিত্রকল্প, কবিতায় ধ্বনি-সংযোগ—ইত্যাদি। সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথিরূপে অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কবিতার পাঠকদের পক্ষ থেকে বলেছিলেন। অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য—মীরা মিত্র

রবীন্দ্রনাথের গান, আনন্দ বাগচী নিজের লেখা কবিতাপাঠ, দীপক মজুমদার 'মধুবংশীর গলি' আবৃত্তি এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত কয়েকটি আধুনিক কবিতা আরো কেউ-কেউ পাঠ করেছিলেন।

দ্বিতীয় কাব্যসভা আগামী আগস্ট মাসে হবার সম্ভাবনা। এই সভা যাতে প্রথমবারের চেয়ে আরো গভীর এবং বর্ধিতায়তন হয় সে-বিষয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে। আশা করা যায় বাংলাদেশের সমস্ত কবিদেরই এতে অকুণ্ঠ সহানুভূতি পাওয়া যাবে। প্রথমবারে মাত্র কয়েকজনের চেষ্টাতেই এই সভা সর্বাঙ্গ-সার্থক হয়েছিল। এবারে ব্যাপক প্রচেষ্টায় তা নিশ্চয়ই সার্থকতর হয়ে উঠবে। কবিতাকে যারা ভালোবাসেন এবং এ-বিষয়ে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা 'কৃত্তিবাসে'র সঙ্গে যোগা-যোগ স্থাপন করতে পারেন।

কৃত্তিবাসের এক বছর

কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যায় বলা ছিল যে, কৃত্তিবাস বাংলাদেশের তরুণ কবিদের মুখপত্র এবং একেবারে তরুণদের ভালো নতুন কবিতার গতিপথের নিরিখ যাতে পাওয়া যায় তার জন্যই এই নতুন পত্রিকা। অর্থাৎ কৃত্তিবাসের রূপই বাংলার তরুণ কবিদের কাব্য-প্রচেষ্টার রূপ। এ-সংখ্যায় কৃত্তিবাসের এক বছর পূর্ণ হলো, এই এক বছরে তরুণ কবিরা বাংলা কবিতার ভাণ্ডার কতটুকু পূর্ণ করলেন? সে-সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন।

এক হিসেবে কৃত্তিবাসের মূল্য ঐতিহাসিক। কারণ, এখানে ভবিষ্যৎ বাংলা কবিতার গতিপথের চিহ্ন রইল। সম্পূর্ণ সার্থক না-হলেও অনেকের কবিতাতে মাঝে-মাঝে যে চমকপ্রদ শব্দযোজনার, অল্পটানে আঁকা গভীর সঞ্চারী ছবির সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে—সেগুলোই যখন আরো গভীর হয়ে জমাট বাঁধবে তখন সার্থক বাংলা কবিতার দর্শন কচিৎ হবে না। সেই কারণেই আমার মনে হয়, বাংলাদেশের তরুণ কবিরা প্রত্যেকেই তিনমাসের মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ কবিতা লিখবেন সেটি কৃত্তিবাসেই পাঠাবেন। কারণ এই কৃত্তিবাসের পাতাতেই তাঁদের ভবিষ্যতের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

কৃত্তিবাসের পাতায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি শঙ্খ ঘোষ। তার কারণ তিনি প্রথম পাঠেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সেই দৃষ্টি ক্রমে-ক্রমে মুগ্ধতায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু সেটাকে আমি তাঁর গুণ বলবো না—কেননা সেটা তাঁর শব্দের সঙ্গে গভীর সখ্যের ফল। শব্দকে তিনি যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারেন—এই শক্তি তাঁর আছে, কিন্তু এই তাঁর একমাত্র শক্তি কেন হবে ? তাই তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে যে মুগ্ধতা—কবিতা শেষ হলে তা পরিণত হয় দুঃখে। যে-কথা তিনি বলতে শুরু করলেন তাই নিয়ে বিস্তর তান বিস্তার করলেন, কিন্তু দুঃখ, পুনরায় সঞ্চারীতে ফিরে এলেন না। তাই তাঁর ভাষাতেই বলি—

'যে কথাটা বলব সেটা…বলা হয় না কিছু !'

তবুও এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তাঁর শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'দিনগুলি রাতগুলি' শুধু তরুণ কবিদের নয়—বাংলা কবিতার এ-বছরে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। শঙ্খ ঘোষের অপর কৃতিত্ব এই যে তিনি নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অশ্রান্ত এবং আমার মতো তাঁর অনুরাগী পাঠকরা তার গতিপথের প্রতি উৎকণ্ঠায় চেয়ে আছে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত'র কবিতায় সেই দুর্লভ আবেগ আছে যার ছোঁয়ায় এক মুহূর্তে সাধারণ কথাতেও আনন্দধ্বনি আসে। এ-কথা নির্ভয়ে এবং নিঃসংকোচে বলা যায় যে বীক্ষা ও বাণীর মধ্যে সার্থক সমাহার—তরুণ কবিদের মধ্যে অলোকরঞ্জন সবচেয়ে বেশি করতে পেরেছেন। অপর এক ক্ষেত্রেও তাঁকে তরুণ কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কৃতী বলব—কারণ তাঁর কবিমন এতই সূক্ষ্ম যে এ-পর্যন্ত তাঁর একটিও মুদ্রিত অপাঠ্য লেখা আমার চোখে পড়েনি। তবে তাঁর প্রেমের কবিতায় আর একটু যৌবনের উত্তাপ থাকলে অধিক তৃপ্তি পেতুম। অলোকরঞ্জন ইতিমধ্যেই বাংলা কবিতায় তাঁর আলাদা পথ করে নিয়েছেন এবং নিজের কবিতার প্রতি তিনি যত্নশীল। কিন্তু ইদানিং দু'-একজনের মুখে শুনতে পাই যে, অলোকরঞ্জন আজকাল অলৌকিক বিষয়ের দিকে ঝুঁকেছেন—এবং একথাও সত্যি যে সম্প্রতি তাঁর মধ্যে মিষ্টিসিজমের প্রতি প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি। যে কবি পত্রান্তরে 'কল্যাণেশ্বরী ঘাটে'র মতো আশ্চর্য কবিতা লিখেছেন তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস মিষ্টিসিজম খাঁটি কবিতার শত্রু এবং প্রায়শই তা প্রতিভাবানকেও দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা লিখিয়েই খুশি রাখে। আমার শেষোক্ত মন্তব্যে যদি কেউ যে-কোনো প্রসঙ্গেই হোক রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করতে চান তবে তাঁর সঙ্গে আমি তর্ক-যুদ্ধে সম্মত !

আমার এক বন্ধু আমাকে একদিন বললেন যে আলোক সরকারের কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব। কথাটা আমাকে অন্য অর্থে ভাবিয়ে তুলল। কারুর কবিতায় অগ্রজ কোনো কবির প্রভাব পড়েছে কিনা তা কি এত সহজে অথবা আদৌ বলা সম্ভব! যদি সম্ভব হয় তবে তো তাঁকে কবি বলতেই দ্বিধা আসে। অবশ্য অনেক শ্রেষ্ঠ কবির প্রদর্শিত প্রকরণগত পথ অনেককে অনুসরণ করতে দেখি, তবে সেটা নিশ্চয়ই অনুকরণ নয়। আর এটা তো স্বাভাবিক যে তরুণ বয়েসে প্রায় প্রত্যেক তরুণ কবিই এঁকে-ওঁকে প্রকরণগত পথে অনুসরণ করবেন, তারপর হঠাৎ একদিন খুঁজে পাবেন আপন স্বরূপ। আর যাঁরা তা না ক'রে বহিরাগত কোনো প্রেরণার সাহায্যে লেখেন অচিরেই তাঁদের ভাণ্ডার ফুরিয়ে তাঁরা নিঃস্ব হয়ে পড়েন। এ উদাহরণ বাংলাদেশে বিরল নয়।

আলোক সরকার সম্বন্ধে আমার বন্ধুর মন্তব্যের মূল খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেলুম যে উক্ত আপাত উক্তির কারণ এই যে আলোক সরকারের কবিতাতে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো শব্দসংখ্যা সীমাবদ্ধ নয়। অনেক অপ্রচলিত শব্দ তিনি নির্ভয়ে ব্যবহার করেন। এটাকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব বললে অত্যন্ত অন্যায় করা হবে। কারণ ঐ শব্দগুলিই আলোক সরকারের কবিতা নয়। তাঁর কবিতা তাঁর নিজস্ব এবং সেখানে হৃদয়ের স্থির বিশ্বাসের প্রতিফলন আছে। এই আদর্শের প্রতি বিশ্বাসই তাঁর কবিতাকে অধিক আকর্ষণীয় করেছে। শুধু তাঁর কবিতা সম্বন্ধে এইটুকুই বক্তব্য যে তিনি বড়ো, বেশি ফর্মের দাসত্ব মানেন। আবেগের সামান্য চিহ্নও যাতে না পাওয়া যায় এজন্য তাঁর কবিতার চারপাশে ফর্মের কড়া পাহারা।

বটকৃষ্ণ দে আবার সম্পূর্ণ তার উল্টো। আবেগ তাঁকে অন্ধ করেছে। ছন্দ এবং শব্দের ওপর যথেষ্ট দখল থাকা সত্ত্বেও তিনি যে কেন বহুদিন ধরে কোনো সার্থক কবিতা লিখতে পারছেন না সেটা আমার কাছে একটা রহস্য।

তাও শেষ হলে হিসাবের হারে কি পাই কি পাই!
হয়তো বা দেখি সেই মেয়ে নাই, গান থেমে গেলে সেই রেশ নাই
রাঙা রুপালির সেই দেশ-ও নাই।...

(চন্দ্রভস্মগান : তৃতীয় সংখ্যা)

ইত্যাকার ঢিলেঢালা লাইন থাকলে সে-কবিতার রসগ্রহণে নিশ্চয়ই প্রচুর বাধা জন্মায়। অথচ তাঁর কবিত্ব আমাকে স্পর্শ করে, তাঁর কোনো-কোনো চকিত উপমা আমাকে মুগ্ধ করে।

প্রেমের কবিতায় অরবিন্দ গুহ'র নিজস্ব একটা রূপ আছে। তবে মনে হয় তিনি ইদানিং নিজের কবিতার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী নন। হ'লে, 'মুহূর্তের ভুলে'র মতো নিটোল সনেট তাঁর কাছ থেকে আরো পাওয়া যেত। যে সহজ পরিবেশ রচনায় আনন্দ বাগচীর কৃতিত্ব, যে অভিনব শব্দযোজনার দুঃসাহস তাকে চিহ্নিত করেছে, যে বিরল চিত্রাভাস তাঁর নিজস্ব—তার সবগুলিই তাঁর কৃত্তিবাসে প্রকাশিত কবিতায় অনুপস্থিত। এ তাঁর নির্বাচনের দোষ। এ-বিষয়ে তাঁকে সচেতন হতে বলি। অরবিন্দ গুহ এবং আনন্দ বাগচীর কবিতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এ-সংখ্যায় অন্যত্র আছে। কবি হিসেবে দীপক মজুমদারের সংযত লেখনী বলে প্রসিদ্ধি আছে। তরুণ বয়েসে কম লেখা ভালো কি মন্দ বলতে পারি না, তবে দীপক মজুমদারকে ধন্যবাদ যে তিনি—

সে আমার স্বর্ণস্বর যৌবনের। স্বপ্নে তার গান।
প্রত্যহের মুহূর্তের চিত্ররেখা। দুর্জয় আকাশ।

(স্বপ্নসৌরভ : তৃতীয় সংখ্যা)

এরকম লাইন লিখেছেন। 'প্রত্যহের মুহূর্তের চিত্ররেখা'—কথাটা আমার কাছে স্মরণীয় উপমা ব'লে মনে হয়েছে।

সুখের বিষয় এক বছরের কৃত্তিবাস দেখলে বোঝা যাবে বাংলাদেশের তরুণ কবিরা বেশ কয়েকটা সার্থক সনেট লিখেছেন। শঙ্খ ঘোষ, অরবিন্দ গুহ, রোহীন্দ্র চক্রবর্তী, মিহির সেন, সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল ভৌমিক, যুগান্তর চক্রবর্তী প্রভৃতির সনেট উল্লেখযোগ্য। কৃত্তিবাসের পাতায় যুগান্তর চক্রবর্তী কয়েকটি সার্থক কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতায় ভাব এবং ভাবরূপের পরিণতির চিহ্ন আছে। শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যরীতিটা আমি ঠিক ধরতে পারিনি। কল্যাণ দাশগুপ্ত কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যায় একটি কবিতা লিখেছেন। কল্যাণ দাশগুপ্তের কোনো উল্লেখযোগ্য আধুনিক কবিতা আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। মানস রায়চৌধুরীর উল্লেখযোগ্য রচনা আমি অন্যত্র দেখেছি কিন্তু তাঁর কৃত্তিবাসের রচনাটি অনুল্লেখ্য। সত্যেন আচার্যর কবিতাটি মনে ছাপ রাখে। শংকর চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা অসংবদ্ধ। তাঁর কাছে কবিতার জন্য একটু মনোযোগ প্রার্থনা করি।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত এবং উৎপলকুমার বসুর কাব্যক্ষেত্রে পদপাতের সূচনাতেই কবিত্বের ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেলাম। উৎপল বসুর এ-সংখ্যার কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের এখন কানকে ছেড়ে মনকে

আশ্রয় করবার সময় এসেছে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়, ফণী আচার্য, শিবশম্ভু পাল, সুরজিৎকুমার দাশগুপ্ত প্রভৃতির রচনায় ভবিষ্যৎ কবির প্রতিবিম্ব আছে। পাকিস্তান থেকে সালেহ্ আহমদ এবং সৈয়দ সামসুল হক উল্লেখযোগ্য লেখা পাঠিয়েছেন। প্রান্তিকা দেবীর 'ছাতাচূড়ার স্মৃতি' মধুর অন্তরঙ্গ রচনা। শোভন সোম এই সংখ্যায় কৃত্তিবাসে প্রথম লিখলেন। এবং ভালো কবিতা।

এ-কথা মানতেই হবে যে কৃত্তিবাসে এখনো একেবারে নতুন অথচ চমকপ্রদ প্রতিভা আবিষ্কৃত হয়নি। এ-কথাও সত্যি যে অনেকের রচনা শুধু ছাপার যোগ্য বলেই ছাপা হয়েছে। অনেকেরই কবিতা সম্বন্ধে এখনো মতামত দেবার সময় আসেনি। সমগ্রভাবে পড়ে মনে হবে তরুণতম কবিরা মোটেই বিষয়-নিরপেক্ষ নন। বিষয়-বৈচিত্র্যের আস্বাদ কচিৎ। কোনো কবিকেই কোনো একটি বিশেষ বিষয় চিহ্নিত করা যায় না। আমরা প্রায়শই শুনে থাকি ইংরেজি সাহিত্যে শ্রীযুক্ত অমুক একজন যুদ্ধ-কবি ইত্যাদি। আমাদের দেশে সে-রকম নেই। ভালোই। কেননা সন্ত্রাসবাদ জন্ম দিয়েছিল নজরুলকে—যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ জন্ম দিয়েছে সুকান্তকে। কবিত্বে উভয়েই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এখনও মুখ্যত রাজনৈতিক মতবাদকে আশ্রয় করে যে-একদল কবিগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ খ্যাতিমান, তাঁরাও অনেকেই নিতান্ত পদ্যলেখক ছাড়া আর কি? রাজনীতি নিয়ে লিখব না—এমনও কয়েকজন আছেন যাঁদের লোকে কবি বলে কারণ তাঁরা লাইনের শেষে মিল দিতে জানেন। তবু, যে-কোনো বিষয়েই তরুণ কবিদের মতপার্থক্য স্পষ্ট। যেমন ধরা যাক্—প্রেম। প্রেমে অলোকরঞ্জনের দার্শনিক নির্লিপ্তি; অরবিন্দ গুহ'র অতি রোমান্টিক ভীরুতা; আলোক সরকারের পাওয়া অপেক্ষা হারানোতে অধিক মনোযোগ, শঙ্খ ঘোষ নায়িকাকে রহস্যে মুড়ে রেখেছেন, যুগান্তর চক্রবর্তীর নায়িকা বেদনাবিদ্ধ, আনন্দ বাগচী নায়িকাকে একটুও ভালবাসেন না—যেটুকু ভালোবাসা সব কবিতার অঙ্গসৌষ্ঠবকে—বটকৃষ্ণ দে কবিতাকে যেন একটুও ভালোবসেন না সবটুকুই নায়িকাকে, তবুও কবিতা কেন যেন লেখেন। এরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কৃতী। কিন্তু যৌবনের উত্তাপ যেন কারুরই লেখায় লাগেনি। এঁরা যে শুধু ব্রাউনিং-এর মতো লিখতে পারেননি তা নয়, লেখার চেষ্টাও করেন না। আমার তো মনে হয় প্রেমকে শরীর থেকে আলাদা করে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখে কবিতায় ফোটানো অনেক সহজ। কিন্তু রক্তমাংসের সবল প্রণয়কে কবিতার আশ্চর্য স্পর্শকাতর ভাষায় প্রকাশ করা তেমন সহজ নয়। সে-কাজে বরং অপেক্ষাকৃত কম দিন ধরে লিখছেন এমন কেউ কেউ

কিছুটা সফল।

কৃত্তিবাসে প্রবন্ধ লিখেছেন—অম্লান দত্ত, সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীলচন্দ্র সরকার, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং সমর সেন। কৃত্তিবাসে যে পুস্তক-সমালোচনা হয়েছে তা একেবারে সার্থক না-হলেও সৎ। সৎ সমালোচনা লেখক সৃষ্টি করে—এই ইংরেজ মতের অনুকূলে ভবিষ্যতে কৃত্তিবাসে সমালোচনায় অধিক মনোযোগ দেওয়া হবে।

একটা কথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, অনেক তরুণ কবি অন্যান্য পত্র-পত্রিকাতে ভালো কবিতা লিখে থাকলেও এখনো কৃত্তিবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি। তাঁদের কাছে এ-কথা আবার জানিয়ে রাখি যে কৃত্তিবাস দলমত-নির্বিশেষে বাংলাদেশের সমস্ত তরুণ কবিদের সার্থক কবিতার সংকলন।

আলোক সরকারের কবিতা

পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক কবি কীটসকে নিয়ে কাব্য-পাঠককে কখনো কখনো চিন্তিত এবং বিব্রত হতে হয়। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যে কৃশকান্তি মুমূর্ষু তরুণ—ক্ষণে ক্ষণে রুধির বমনে রক্তাক্ত-ওষ্ঠ এবং অসার্থক প্রেমে ভগ্নহৃদয়,—তাঁর কাব্য-দীর্ঘশ্বাসে আমাদের উদাস করে এবং অগ্নি নিকষিত স্বর্ণের মতো সুন্দরের বন্দনায় আমাদের চিত্তকে পুণ্য করে, সেই কবির জীবনকে দীর্ঘ করে দেখবার সাধ হয়। কল্পনা করতে ইচ্ছে হয়—দীর্ঘজীবী, সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক, সুখী কীটসের কাব্য-ধারা কোন পথে ক্রম-অগ্রসর হতো এবং কোন বৈচিত্র্যের ফসল ফলতো তাঁর মানসে? এ-প্রশ্নের উত্তর মেলে না বলে দুঃখের অবকাশ নেই, কারণ তখন অনিবার্যভাবে মনে হবে যে তাঁর কাব্য তাঁর জীবনের মতোই সম্পূর্ণ এবং স্বাধীন। সেই সঙ্গে এ-কথাও বিস্মৃত হওয়া যায় না যে তরুণ বয়সই কাব্যরচনার প্রকৃষ্ট সময়, কারণ কবি মূলত আবেগ-ব্যবসায়ী। এবং দর্শন সঞ্চারী নাট্যকার বা ঔপন্যাসিককে হতে হয় অভিজ্ঞতায় প্রৌঢ়। কিশোর বয়েসে কাব্যরচনা করে বহু কবি জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন, কিন্তু উক্ত বয়েসে নিপুণ গদ্য-রচনায় কৃতী ব্যক্তির উদাহরণ প্রায় চোখে পড়ে না।

এই কথা স্মরণ রেখে বাংলাদেশের তরুণ কবিদের কাব্য প্রচেষ্টার আলোচনা রীতিমতো সংগত বলে বিবেচিত হবে। দুঃখের বিষয় যার অভাব প্রায়শই আমাদের পীড়িত করে। রবীন্দ্র-বিদ্রোহের অনিশ্চিত অস্থিরতা এখন আর বাংলা কাব্যের বিষয়বস্তু নয়—বরং রবীন্দ্রনাথকে স্থিরভাবে মেনে নিয়ে আধুনিক জীবনের বিভিন্ন অনুভূতি বাংলা কাব্যে স্থান পেয়েছে। প্রাচীন ঈশ্বর-বন্দনার মতো আধুনিক মতবাদ-মাহাত্ম্য বর্ণনার সুর ঈষৎ ফিকে হয়ে এসে তাতে কবিত্বের রঙ লেগেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তরুণ কবিদের সম্পর্কে আলোচনা—নিতান্ত সৎ-সাহিত্যের ধারা রক্ষার জন্যই প্রয়োজন।

আলোক সরকার তরুণ কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বিশিষ্ট। তিনি তাঁর অগ্রজ কবি—অরুণকুমার সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নরেশ গুহ, মণীন্দ্র রায়, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি থেকে পৃথক এবং সমবয়সী শঙ্খ ঘোষ, অরবিন্দ গুহ, রাম বসু, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আনন্দ বাগচী, যুগান্তর চক্রবর্তী প্রভৃতি থেকেও ভিন্নসুর।

আলোক সরকারের কবিতার মধ্যে এক শান্ত নীরবতা সব সময়ে চোখে পড়ে। যেন বহুলোকের জনতার মধ্যে একটি পৃথক লোক হেঁটে চলেছে। নিজের বলার কথা কখনো তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে বলেননি। তাঁর কণ্ঠস্বর কর্কশ প্রচারকের নয় বা নীতিবিদের নয় এবং এমনকি সুকণ্ঠ গায়কেরও নয়। অধিকাংশ জায়গাতেই তাঁর কণ্ঠস্বর স্বগতোক্তির মতো। যদিও তাঁর কবিতায় কখনো আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটেনি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর ভাষা ইস্পাতের মতো কঠিন এবং শীতল শুনিয়েছে।

তাঁর কবিতাকে একমাত্র যথার্থ "অনন্য নির্ঝর" নামে অভিহিত করা যায়। দিনের শত কাজে মগ্ন, অতৃপ্তিকর, নিরর্থক সময় হরণে নিয়োজিত কবির মনের মতো "অনন্য নির্ঝর"। অদৃশ্য বাজনা বেজে উঠলেই তাঁকে ছুটে যেতে হয় চির-দিনের প্রতিশ্রুতির অন্য নাম জানবার জন্য পথের বাঁকে। যদিও 'গ্রহণ করবার অসামর্থ্যে' তার 'ম্লান রূপান্তর' হয় এবং ডুবে যেতে হয় "প্রস্তুতির ভুলে অন্ধকার পীত ব্যর্থতায়"। তবু বহে চলে "অনন্য নির্ঝর"। সেই নির্ঝরের নাম কবিতা এবং আলোক সরকারের কবিতা।

তাঁর কবিতার প্রথম এবং প্রধান গুণ সচ্চরিত্রতা। প্রতিটি কবিতায় তিনি তাঁর চারিত্রিক সমতা রেখে চলেছেন এবং আজ পর্যন্ত কোথাও তার স্বরচ্যুতি হয়নি।

অন্য এক পরিচয় আছে
জানবে না কোনদিন বিকেলের মায়াবী আলোয়
রাজার কুমার হ'য়ে আমি পথ হাঁটি। [সহজ]

বিকেলের মায়াবী আলোয় তাঁর সেই অন্য পরিচয় চিনে নিতে পাঠকদের অসুবিধে হয় না এবং একদিন সেই অন্য পরিচয়ে আলোক সরকার ভবিষ্যৎ বাংলা কবিতায় বিশিষ্ট আসন অধিকার করবেন—এই তাঁর অনুরাগী পাঠকদের স্থির বিশ্বাস।

কাব্যগ্রন্থ প্রসঙ্গে

সাম্প্রতিক কালের কবিদের বিশেষ অন্তরঙ্গ পত্রিকা শতভিষা। এই অনতি-প্রচারিত জাঁকজমকহীন পত্রিকাটিতে কোনো বিজ্ঞাপন গ্রহণ করার রীতি নেই, পৃষ্ঠার সংখ্যা মুদ্রিত থাকে না, অধিকাংশ সংখ্যাতেই প্রবন্ধেরও স্থান সঙ্কুলান হয় না, শুধু কবিতা এবং পুস্তক সমালোচনা। শতভিষাই সম্ভবত বাংলাদেশের একমাত্র পত্রিকা যা পাঠক বা ক্রেতার মুখাপেক্ষী নয়। শতভিষা শুধু কবিদের পত্রিকা। সম্প্রতি শতভিষার ঊনবিংশ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। শতভিষা প্রকাশ করেন শ্রীদীপঙ্কর দাশগুপ্ত। ১।এ, বিজয় মুখার্জী লেন। ২৫

শতভিষা প্রকাশনী থেকে সম্প্রতি আধুনিক কাব্য পরিচিতি এই পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত তরুণ কবিদের সংক্ষিপ্ত এবং সুদৃশ্য কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং আলোক সরকারের মিলিতভাবে অনূদিত ষোলটি ফরাসি প্রেমের কবিতার সংকলন। নাম, 'ভিনদেশী ফুল'। সুকুমার রায়ের 'আজ চোখ মেলে'। শান্তিকুমার ঘোষের 'শুধু তো নিসর্গ নয়'। অরবিন্দ গুহ'র 'প্রথমপুরুষ'। অন্যান্য আরো কয়েকজনের বই শীঘ্র প্রকাশিত হবে। প্রত্যেকটির দাম আট আনা।

পূর্বমেঘ নামের একটি পত্রিকার প্রকাশনী বিভাগ থেকে তরুণ কবিদের কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে শিশির দাশের 'জন্মলগ্ন', এবং 'অমৃত যন্ত্রণা' নামে সতেরো জন যুবকের প্রেম সম্পর্কিত কবিতার একটি সংকলন।

এঁদের আগামী বই শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'অজ্ঞাতবাস'।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, 'লখিন্দর'। এঁর প্রথম বই 'রাণুর জন্য' অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এই নতুন, শোভন গ্রন্থটিতে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুরাগীমাত্রই খুশি হবেন।

আধুনিক কবিতার ক্রমবর্ধমান রুচিশীল পাঠকদের জন্য তরুণ কবিদেরও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছে। কিছুকালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে শঙ্খ ঘোষের 'দিনগুলি রাতগুলি', তরুণ সান্যালের 'মাটির বেহালা', মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'আষাঢ়ে শ্রাবণে', ধনঞ্জয় দাশের 'শরসন্ধান', রাম বসুর 'দুঃখের দর্পণে', দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলাম্বরী', ফণিভূষণ আচার্যের 'ধুলিমুঠি সোনা', পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'তৃতীয় নয়ন', রাজলক্ষ্মী দেবীর 'হেমন্তের দিন', চিত্ত ভট্টাচার্যের 'পত্ররাগ', চিত্ত সিংহের 'বাউল', রবীন্দ্র বিশ্বাসের 'লগ্ন গোধুলি'। মানবেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একান্তর', সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'নাবী ফসল', সুনীল বসুর 'তিমির তরঙ্গ'।

শীঘ্র প্রকাশিত হবে দীপক মজুমদারের 'এর পুরবী ওর বিভাস', ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'মায়াবতীর দুঃখ', অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ও কুশল মিত্রের 'কৃষ্ণকলি' (নিগ্রো কবিতার অনুবাদ)। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত'র 'এক ঋতু'।

অচিরকালের মধ্যে প্রকাশিত হওয়া উচিত অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, যুগান্তর চক্রবর্তী, আলোক সরকার, দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, শোভন সোমের কাব্যগ্রন্থ।

নমিতা মুখোপাধ্যায়—এই ছদ্মনামে এতকাল কবিতা লিখেছেন শরৎ মুখোপাধ্যায়। সহজাত কুণ্ঠা এবং সংকোচবশত নিজেকে তিনি ছদ্মনামের আড়ালে রেখেছিলেন। শরৎ মুখোপাধ্যায়ের 'সোনার হরিণ' নামের কাব্যগ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে কৃত্তিবাস প্রকাশনী থেকে। কৃত্তিবাস প্রকাশনীর অন্যান্য বই আনন্দ বাগচীর 'স্বগত সন্ধ্যা', প্রণব মুখোপাধ্যায়ের 'অতলান্ত', ফণিভূষণ আচার্যের 'ধুলিমুঠি সোনা', পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'তৃতীয় নয়ন'।

দীর্ঘকাল পর কৃত্তিবাসের অষ্টম সংকলন প্রকাশিত হলো। এই অপ্রতিরোধ্য বিলম্বের জন্য কৃত্তিবাসের সম্পাদকমণ্ডলী সমস্ত পাঠক, লেখক এবং গ্রাহকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছেন। অনিয়মিত প্রকাশের জন্য বহু রচনা এসে জমে আছে এবং এ-সংখ্যাতে তার সামান্য অংশ পত্রস্থ হলো।

যাঁরা রচনা প্রেরণ করেন, তাঁদের একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। কিছু কবিতা এবং প্রবন্ধ পুস্তক-সমালোচনা প্রকাশ করাই কৃত্তিবাসের উদ্দেশ্য নয়।

তরুণ কবিদের শক্তিমত্তা, বৈশিষ্ট্য এবং ভাবনার রূপ প্রকাশের জন্য কৃত্তিবাস পত্রিকা। তরুণ কবিদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন শুধু ছাপা হবার যোগ্য কবিতা পাঠিয়েই নিরস্ত না হন। নতুন পরীক্ষা বা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত কবিতা কৃত্তিবাসে প্রকাশিত হলে কৃত্তিবাসেরই গৌরব বর্ধিত হবে।

বুদ্ধদেব বসু এবং উত্তরকাল

জীবনের পঞ্চাশ বছর এবং বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে পঁয়ত্রিশ বৎসর অতিক্রম করলেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর ছাপা সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার বয়সও পঁচিশ হয়ে এল।

যে-বয়সে রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাসংগীত লিখেছিলেন, সে-বয়সে বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' প্রকাশিত হয়েছে। সন্ধ্যাসংগীতের লেখক বাড়ির সান্ধ্য বৈঠকে বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের কবিতায় মশগুল, সেই তথাকথিত লিরিকের মোহে স্বতন্ত্র পদক্ষেপে তখনও প্রয়াসী হননি। কিন্তু 'বন্দীর বন্দনা'র রচনাকালে চারদিকে সাজসাজ রব, হাওয়ায় বারুদের গন্ধ, একদল লেখক বিদ্রোহে বেরিয়েছেন, যে-বিদ্রোহের লক্ষ্য 'শান্তিনিকেতনের প্রাচীন বনস্পতি'। সেই লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে কনিষ্ঠতম এবং প্রবলতম কবির নাম বুদ্ধদেব বসু। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে সেই প্রায় বালক-কবির গুটিকয়েক ঝাঁঝালো কবিতা একদা শত শত সজনীকান্ত দাসকে উত্তেজিত করেছিল।

এই শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ দশকে রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রতিভা নতুন নতুন দিকে আবিষ্কার করেছেন, পাঠকদের মুগ্ধ এবং অন্যান্য লেখকদের মূঢ় করে ছেড়েছেন। সেই সময় হয়তো আত্মমগ্ন হয়ে নিজের সুরে সার্থক কবিতা রচনা করা কারুর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। যে-সমস্ত কবি রবীন্দ্রনাথকে চরম বলে মেনে নিয়েছেন, তার বাইরে একচুলও এগোননি, তাঁরা ম্যাট্রিকুলেশন সিলেকসন্-এ জাঁদরেল জাঁদরেল ব্যাখ্যা-যোগ্য পঙ্‌ক্তি-সমন্বিত কবিতা সাজিয়েই শেষ হয়ে গেছেন; আত্মাভিমানী কবিরা সকলেই রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনধ্যুষিত বক্রপথে যেতে চেষ্টা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ছন্দের কারিকুরি করেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন, নজরুল ইসলাম উচ্চকণ্ঠে, অমার্জিত সবল প্রাণবেগে। শক্তিমান

কবি ছিলেন সুকুমার রায় কিন্তু কখনও বালকদের এলাকা ছেড়ে আসেননি, শুধু স্বাতন্ত্র্য প্রমাণের জন্যই যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দুঃখবাদ নামক এক কৃত্রিম বস্তুর আমদানি করেছিলেন।

কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের বিদ্রোহও প্রায় এই জাতেরই। রবীন্দ্রনাথের রচনায় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়নি—এমন দু'টি বিষয়কে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন। কৃষক-শ্রমিক-শিক্ষাহীনদের প্রতি অভিজাত-সুলভ মহত্ব বা করুণার বদলে সমান অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলা এবং নায়িকার শরীর বর্ণনা ও প্রেমে জৈবিক বাসনার মূল্য স্বীকার। কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকেরা ছিলেন বিশেষ শক্তিমান এবং নিজেদের মনের কথা তাঁরা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলতে পেরেছিলেন। কবিতায় বিশেষভাবে অগ্রগতি দেখিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বুদ্ধদেব বসু।

'বন্দীর বন্দনা'র চড়া সুরের কবিতাগুলি আমাদের মতো যুবকদের কাছে এখন অকিঞ্চিৎকর লাগে। সেই সময়কার বিদ্রোহের মূল্য আমরা এখন ঠিক অনুভব করতে পারি না। ঈশ্বরের সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রতিবাদ বা সমর্থন কোনোটিতেই আমরা উৎসাহ বোধ করি না, রক্তমাংসের রমণী-শরীর ভোগ এবং অতিন্দ্রিয় প্রেমের দ্বন্দ্ব আমাদের কাছে নিতান্তই সামান্য ঘটনা এবং আকাশ, অরণ্য, স্ত্রীলোকের চক্ষু এবং যোনিদেশের সৌন্দর্য বর্ণনায় আমাদের সমান নির্লিপ্তি। কিন্তু চার পয়সায় ষাটবার জ্বালবার মতো আগুন এখন আমরা কিনতে পারি বলেই প্রমিথিয়ুসের মূল্য আমাদের কাছে ন্যূন হয়ে যায়নি। উপমা হয়তো একটু গুরুতর হয়ে গেল—কিন্তু এতে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব নিশ্চয়ই বোঝা যাবে। আমাদের এখনকার বহুপ্রকারের স্বাচ্ছন্দ্য বুদ্ধদেব বসু এবং তাঁর সমসাময়িক বন্ধুরা এনে দিয়েছেন। বিশেষত উত্তরকালের উপর বুদ্ধদেব বসুর দান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। বাংলা কবিতার ইতিহাসে এবং বর্তমান সময়ের তরুণ কবিদের উপর বুদ্ধদেব বসুর প্রভাব—এই আলোচনার মূল লক্ষ্য হবে।

কিছুকাল ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রগতি'তে এবং পরবর্তীকাল থেকে 'কবিতা' পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুর যে-পরিচয় আছে—সে-পরিচয় তাঁর পরপর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে অনেক সত্য। অগ্রগমনের পথে কখনও তিনি একা আসেননি, কবিতার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কবিকে প্রস্তুত করে এনেছেন। যে পথ দিয়ে রাজার সৈন্যবাহিনী যায়—তার আশেপাশে চিহ্ন থাকে। বুদ্ধদেব বসুর আগমনের পথে চিহ্ন আছে।

এক সময় অক্লান্ত লেখক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। একই সঙ্গে প্রচুর কবিতা-গল্প-

উপন্যাস-প্রবন্ধ রচনা করেছেন এককালে। কেন জানি না, কবিতার চেয়ে প্রবন্ধ এবং উপন্যাসেই বুদ্ধদেব বসুর চরিত্র আমার কাছে বিশেষভাবে ধরা পড়ে। 'তিথিডোরে' রাজেনবাবু এবং সত্যেন উভয়ের মধ্যেই—এমনকি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিনে মদ্যপানরত কবির মধ্যেও বুদ্ধদেব বসুকে স্পষ্ট চেনা যায়। তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই নায়ক একজন লেখক, এই সমস্ত নায়কদের মুখ দিয়ে সাহিত্য, বিশেষত কবিতা সম্বন্ধে তিনি যে-সমস্ত মত ব্যক্ত করেছেন, তাঁর নিজের কবিতায় আমি তার বিশেষ মিল পাইনি। শেষ পরিচ্ছেদ ব্যতীত, 'মৌলিনাথ' উপন্যাসের নায়ক বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং—একথা বললে বিশেষ অত্যুক্তি হবে না বোধহয়। সেই চরিত্র আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে কোনো বিশেষ একটি কবির চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে সে-রকম কবির চরিত্র প্রথম শ্রেণীর কবিদের মধ্যে শুধুই জীবনানন্দ দাশের আছে।

তাঁর প্রেমের কবিতায় লরেন্সীয় তীব্রতা একদা বাংলা কবিতাকে প্রভাবিত এবং এখনকার কালের পাঠকদেরও মুগ্ধ করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে গভীর ঔদাস্যও আমাদের কাম্য ছিল। আসলে কোনো কবি কি সত্যিকারের ভোগ চায়? হয়তো চূড়ান্তভাবে ভোগ করে, কিন্তু ভোগ চায় না। সাময়িক ক্লান্তি এবং চিরন্তন ঔদাসীন্যই কবিতার একমাত্র বিষয়বস্তু হওয়ার যোগ্য। জ্ঞান এবং অহংকারের তুচ্ছতা একমাত্র কবিই বুঝতে পারে। কীট্সের সুন্দরের বন্দনার মধ্যেও রক্তের ছিটে লেগে আছে, ইয়েটস্‌কেও বলতে হয়েছে,

> I would be—for no knowledge is worth a straw—
> Ignorant and wanton as the dawn.

'কঙ্কাবতী'তে 'চুল' কিংবা 'শেষের রাত্রিতে' চুলের বর্ণনা পড়ি—

> তোমার চুলের মনোহীন তমো আকাশে-আকাশে চলেছে উড়ে
> আদিম রাতের আঁধার বেণীতে জড়ানো মরণ-পুঞ্জ ফুঁড়ে ··

কিন্তু আবার 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তে এসে

> ডুবলো কালো চুলে বস্তু বিশ্বের ব্যস্ত উচ্ছ্বাস
> ডুবলো বিপ্লব নিশীথ-নিঃসীম নীল সমুদ্রে, (কালো চুল)

পড়ে আমাদের মন না-না বলে ওঠে, কবির বিশেষ আসক্তি আমাদের কাছে প্রায় অশ্লীল লাগে। তখন জীবনানন্দের সেই অমোঘ পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে, অর্থ নয়, কীর্তি নয়—স্বচ্ছলতা নয়—আরো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের রক্তের ভিতরে খেলা করে; আমাদের ক্লান্ত করে ক্লান্ত—ক্লান্ত করে—।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় যৌবন এবং ছন্দ বহুবিচিত্র। আমাদের অভীপ্সিত ঔদাসীন্য তাঁর কবিতায় খুঁজে না পেলেও আর একটি জিনিস পেয়েছি, যে-বিষয়ে বাংলা কবিতার ইতিহাসে তিনিই প্রথম উল্লেখযোগ্য। বাংলা কবিতাকে তিনি তথাকথিত জীবনদর্শনের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। সহজিয়া বাউল বৈষ্ণব ঔপনিষদিক বৈদান্তিক ইত্যাদি দর্শন কবিতার মধ্যে খুঁজে বার করা, জীবনানন্দের 'সমারূঢ়' কবিতার নায়কদের প্রিয় পেশা। অধ্যবসায়ী মূষিকের মতো পুঁথি কেটে-কেটে সেই সমস্ত দর্শন আবিষ্কার করে তাঁরা উদ্বাহু নৃত্য করেন। এই জন্যই সমালোচক-বন্দিত বৃদ্ধ কবিরা দেশে দেশে সরকারি পুরস্কার লাভ করেন—কিন্তু কদাচিৎ যুবক-পাঠকদের মন হরণ করতে পারেন। বুদ্ধদেব বসু প্রথম এই সমস্ত প্রভাব সচেতনভাবে অস্বীকার করেছেন। তিনি শুধু কবিতার জন্যই কবিতা রচনা করেছেন। দৃশ্যমান পৃথিবীকে তিনি শরীর দিয়ে স্পর্শ করেছেন এবং সেই স্পর্শের অনুভব আমরা তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে পেয়েছি। এজন্য ইংরেজি কবিতার সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগও কিছুটা দায়ী। আশা করি ফাউস্টের উভয় খণ্ডের গ্যেটের মতো কবিত্বের ব্যবধান তাঁর মধ্যে কখনও আসবে না। এই প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের কথা অবশ্যম্ভাবীরূপে আসে, কিন্তু জীবনানন্দ একেবারে স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু। কল্লোলের কবিদের মধ্যে তিনি কোনো বিদ্রোহ-উত্তেজনায় যাননি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই সবচেয়ে নতুন পথ এনেছেন—একথা অন্য আলোচনার বিষয়।

"নাগরিক", "চতুর" কবিতায় বুদ্ধদেব অসাধারণ এবং ছন্দে তাঁর বহুবিধ পরীক্ষা অন্য কবিদের যত-না প্রভাবিত করেছে তার চেয়ে বেশিভাবে তরুণ কবিদের আরও বহু বিচিত্র ছন্দ পরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

যে-যৌবন বুদ্ধদেব বসুর এত প্রিয় ছিল, সেই যৌবনও একদিন তাঁকে ছেড়ে গেল। সেই হাহাকার তাঁর সেদিনের অনেক কবিতায় ছড়িয়ে আছে। যেন যৌবন রসেটির মতো তাঁকে বলল, যেমন সে সব প্রৌঢ় ব্যক্তিকেই বলে—

Look in my face. My name is
Might-Have-Been ;

আর একটি বালক অত্যন্ত নিপুণ কলম নিয়ে উপস্থিত হলো। বুদ্ধদেব বসু তাঁকে তরুণতম কবি বলে স্বাগত জানালেন। তাঁর নাম সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

এই প্রবন্ধে সমগ্র ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হবে না বলে অন্তর্বর্তী কিছু কবি, সমর সেন ইত্যাদির কথা বাদ দেওয়া হলো। ইতিহাসে স্থান পাওয়া ছাড়া

সমর সেনের অন্য কোনো মূল্য আছে বলেও বর্তমান লেখক স্বীকার করে না। কামাক্ষীপ্রসাদ এবং বিমলাপ্রসাদ শক্তিমান কবি হওয়া সত্ত্বেও কখনও বুদ্ধদেব-জীবনানন্দের প্রভাব অস্বীকার করতে পারেননি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য একসময় কবিতায় আবার নতুন প্লাবন এনে দিয়েছিলেন। ছন্দ-উপমা-শব্দ নির্বাচনে বিশেষ দক্ষ একদল কবিকে পরবর্তীকালে তাঁদের অনুসরণ করতে দেখা গেল—যাঁদের সাফল্য এবং ব্যর্থতার উদাহরণ বেশ কিছুদিন পর্যন্ত নবীন কবিদের কাছে শিক্ষনীয় হয়ে থাকবে।

'কবিতা' পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় অসাধারণ চোখ ঝলসানো কবিতা লিখে অল্পদিনের মধ্যেই বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবে গেছে এমন উদাহরণ বিরল নয়। এরই মধ্যে ধীরে ধীরে একদল শক্তিশালী কবিগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। অরুণকুমার সরকার, নরেশ গুহ, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—এঁরা সকলেই অন্তত একসময়ে বুদ্ধদেব বসুর স্কুলের অন্তর্গত ছিলেন। বিষ্ণু দে-কে কেন্দ্র করেও এরকম আর-একটি কবিগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। নরেশ গুহকে প্রথমদিকে বুদ্ধদেব বসুরই পরিপূরক মনে হয়েছিল, কোথাও কোথাও অমিয় চক্রবর্তীর সংকেত। ক্রমশ নিজের পথে বেরিয়ে আসতে আসতে তিনি হঠাৎ লেখা বন্ধ করে দিয়ে পাঠকদের রীতিমত অস্বস্তিতে রেখে দিলেন। চটুল ভঙ্গির সঙ্গে অত্যন্ত তীব্র রোমান্টিক আবেগের মিশ্রণ করলেন অরুণকুমার সরকার। সামান্য কথাকেও কি করে অসামান্যভাবে বলা যায় সেই দুর্লভ পদ্ধতি আমরা তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা করেছি।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রধান চারজন তরুণ কবির মধ্যে একমাত্র, যিনি কখনও 'কবিতা' পত্রিকায় লেখেননি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, অন্য কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না থেকেও কি করে তিনি বুদ্ধদেব বসুর কবিতার মোহ উপেক্ষা করেছেন। তাঁর কবিতা সব সময়ই পরিচ্ছন্ন, ঝর্ণার জলের মতো স্বচ্ছ। শব্দ এবং ছন্দের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে আবার ততোধিক মনোযোগ এবং বুদ্ধির সাহায্যে তাকে গোপন করতে তিনি জানেন।

'কবিতা' পত্রিকার মান ইদানিং অনেক নেমে এসেছে বলেই মনে হয়। আঁটোসাঁটো গড়ন, দূর-কল্পিত উপমা, সুচারু ছন্দ-মিল প্রায় সব কবিতাতেই দেখা যাচ্ছে কিন্তু তার বেশির ভাগ কবিতাই দায়িত্বজ্ঞানহীন, দিক্‌ভ্রষ্ট। এতকাল পর কি বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকা সম্বন্ধে ক্লান্ত হয়ে এসেছেন?

কেননা, ক্লান্তির সুর আছে তাঁর শেষতম গ্রন্থ 'যে আঁধার আলোর অধিক'-এ।

এই বইতে বুদ্ধদেব বসু একেবারে নতুন রূপে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা তাঁর নবতর রূপের উদ্ভাসের জন্য প্রতীক্ষা করে রইলাম।

কোনো ঐতিহাসিক তারিখ কিংবা ঘটনা স্মরণ করার জন্য কৃত্তিবাসের কোনো বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করিনি কখনো। সনেট নামক কাব্য-রূপে বাঙালি আধুনিক কবিবৃন্দ কতদূর প্রয়াসী, পারঙ্গম তার একটি রূপ প্রকাশ করাই ছিল এ-সংকলনের প্রাথমিক আকস্মিক অভিলাষ। এবং এ-পরিকল্পনায় আমাদের আসক্ত করেছিলেন শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর পত্রী। কালক্রমে সাহিত্য ইতিহাসের আলোচকদের কাছে জানা গেল যে এ-বৎসর বাংলা সনেটের শতবর্ষ পূর্ণ হলো। ১৮৬০ সালে কলকাতায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেন: নাম—'কবিমাতৃভাষা'। পরের সংশোধিত নাম, 'বঙ্গভাষা', আরম্ভ: হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব··· ইত্যাদি। সুতরাং এই কার্য-কারণ সম্বন্ধে কৃত্তিবাসের বর্তমান সংখ্যাটিকে বাংলা সনেট-শতবার্ষিকী স্মারক সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

সনেটের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিশেষ কিছু নেই। অল্পবিস্তর সকলেই জানেন। সনেটের বিশেষ রূপটি নির্ধারিত হয় Guittone of Arezzo (মৃত্যু ১৪৯৪)-এর রচনায়। ইংরেজ কবিরা সনেট সম্পর্কে সচেতন হন ১৫৫৭ সালে Tottles Miscellany প্রকাশিত হবার পর। ফ্রান্সেও এই সময়েই Desportes, De Baif, Ronsard প্রভৃতি সনেট রচনা শুরু করেছেন। তারপর থেকে সনেটের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে বহু মতামত গড়ে উঠেছে। অনেক কবি নির্দিষ্ট রীতি ছেড়ে স্বেচ্ছাপথে লিখতে চেয়েছেন। এখন আর মিলবন্ধন কিংবা পঙ্‌ক্তি বিভাগের কোনো নিয়মই নেই। বিষয় সঙ্গতি রেখে সনেটগুচ্ছও রচিত হয়েছে অনেক। উদাহরণ হিসেবে নাম করা যায়—রবার্ট ব্রাউনিং তাঁর স্ত্রীর লেখা যে সনেট 'মালা সনেট্‌স্ ফ্রম দি পর্টুগীজ' নামে প্রকাশ করেছিলেন। ব্রাউনিং তাঁর পত্নী ব্যারেটকে আদর করে পর্টুগীজ বলে ডাকতেন।

বাঙালি কবিদের কাছ থেকে সনেট চেয়েছিলাম। কিন্তু এ-সংকলনে মুদ্রিত

সমস্ত রচনাকেই সনেট বলে অভিহিত করা যায় কিনা জানি না। অষ্টক ষষ্টক ভাগ অনেকেই মানেননি। কয়েকটিতে মিল ব্যবহার নেই, সর্বত্র লাইনও সমমাত্রায় নয়। আমরা এগুলি সানন্দে গ্রহণ করেছি এই কারণে যে, কবিরা সকলেই সনেটের অ্যাকাডেমিক অভিধা জেনেও এ-রকম লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

জীবনানন্দ দাসের রচনাটি তাঁর অনুজ শ্রীঅশোকানন্দ দাসের সৌজন্যে পাওয়া গেছে। এটি জীবনানন্দের অল্প বয়সের রচনা, অসংস্কৃত। প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অমিয় চক্রবর্তী কখনও সনেট লেখেননি। বিষ্ণু দে আমাদের একটি পুরোনো সনেট ছাপতে বলেছিলেন। কিন্তু যেহেতু বিষ্ণু দে-র সমস্ত মুদ্রিত রচনার সঙ্গেই কৃত্তিবাসের প্রায় সব পাঠকই পরিচিত সে-কারণে পুনর্মুদ্রিত করা প্রয়োজনবোধ করিনি। বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত নতুন সনেট রচনার অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছেন। দু'জন আধুনিক কবি—সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং আলোক সরকার আদর্শগত কারণে সনেট রচনার বিরোধী—এ-কথা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছেন। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শুদ্ধসত্ত্ব বসু প্রভৃতি যাঁরা কিছু সনেট লিখেছেন সেরকম অনেক কবির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ করতে পারিনি বলে অপরাধী হয়ে রইলুম।

আধুনিক বাংলা কবিতায় উজ্জ্বল সনেট বিশেষ নেই, কবিরা তেমন উৎসাহী নন। যে-কোনো রকম প্যাটার্ন পোয়েট্রি উৎসাহের যোগ্যও নয়, আমাদের বিশ্বাস। মনে হয়, অচিরকালের মধ্যেই এই কাব্যরূপটিও প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবেই গণ্য হবে।

আকাদমি পুরস্কার

এ-বৎসর বাংলা ভাষায় কোনো গ্রন্থ পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হয়নি। এজন্য বাঙালি লেখকদের মধ্যে কিছু উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছিল। আনবিক অস্ত্র বিস্ফোরণেও বিচলিত হন না এমন নিথর যে লেখককুল—তবু যা হোক কিছু

পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে বলেই তাঁদের চাঞ্চল্য কখনো দৃষ্টিগোচর হয়। পুরস্কারের যোগ্য কোনো গ্রন্থ নেই—যদি এরকমই হয় বিচারের কঠোর মান, তবে খুবই সুখের কথা। কিন্তু তাহলে একথাও প্রমাণিত হলো—অন্যান্য বৎসরে পুরস্কারপ্রাপ্ত 'কলকাতার কাছেই' প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি। এ-বৎসর পুরস্কার না দেবার জন্য যাঁরা প্রতিবাদ করলেন, পূর্ব পূর্ব বৎসরের ঐ সব অপসৃষ্টিকে পুরস্কার দেবার প্রতিবাদ করেননি কেন তাঁরা? যারা পুরস্কার দেয় এবং যারা পায় তাদের হাস্য-কর ধৃষ্টতার প্রতিবাদ করার লোক নেই। পুরস্কার পায় কারা? যারা তথাকথিত জীবনে নিরুদ্বেগ—যাদের অর্থসম্পদ এবং প্রতিভা যথাক্রমে প্রচুর আছে এবং সামান্যতম নেই। এবং যাদের হাত সব সময়েই অপরের পদধূলি নিয়ে নিয়ে নোংরা হয়ে থাকে। এবার বুঝি অনেকগুলি নোংরা হাত বাড়ানো ছিল—তাই কর্তৃপক্ষ বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন (হুমায়ুন কবীর সেইরকমই বলেছেন)।

নোবেল প্রাইজ নিতে অস্বীকার করে বার্ণার্ড শ বলেছিলেন, আমাকে পুরস্কার দেবার কোনোই মানে হয় না, এখন আমার পুরস্কারের দরকার নেই। আমাকে এখন দেবার মানে হলো, যে-লোক জলে ডুবতে বসেছিল - সে কোনো-ক্রমে পারে পৌঁছুলে তার দিকে লাইফবেল্ট ছুঁড়ে দেওয়া। ঐ প্রসঙ্গেই বার্ণার্ড শ আর-একটি ভারি মজার কথা বলেছিলেন, ডিনামাইট নামক মারাত্মক অস্ত্রটি আবিষ্কারের জন্যও আমি আলফ্রেড নোবেলকে ক্ষমা করতে পারি কিন্তু একমাত্র নরদেহধারী দানবের পক্ষেই নোবেল প্রাইজ আবিষ্কার করা সম্ভব!

কোনো শিল্পীই পুরস্কারের প্রত্যাশী নয়। পুরস্কার একমাত্র নেওয়া সম্ভব ঈশ্বর অথবা শয়তানের হাত থেকে—ভোটে-জেতা মানুষের কাছে কোন শিল্পী পুরস্কার নেবে? এখন অবশ্য যে-কোনো পুরস্কার মানেই—কোনো সম্মান বা মর্যাদা নয়, কিছু অর্থপ্রাপ্তি। এবং যেহেতু অর্থের মূল্য আমাদের কাছে সম্মানের চেয়েও বেশি সেইজন্যই পুরস্কারগুলি সম্পর্কে আমরা মন্তব্য প্রকাশ করছি।

যাদের অর্থের প্রয়োজন তাদেরই দেওয়া হোক এই অপচয়যোগ্য অর্থরাশি। আমাদের দেশের অনেক লেখকের প্রথম যৌবনের রচনায় ভয়ানক চমক দেখা যায়—কিন্তু টিঁকতে না পেরে দু'-এক বছরের মধ্যেই তারা বাজারে নাম লেখায়। এখন বাংলাদেশে যারা সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং যারা বাংলা সাহিত্যের ভয়ঙ্কর স্যাবোটিয়ার্স—তারাও কিন্তু অনেকে প্রথমে কোনো আদর্শ নিয়েই সাহিত্য জগতে এসেছিলেন। ঐরকম তরুণ বয়সের আদর্শকালে তাদের এই আর্থিক পুরস্কার দিয়ে সমর্থন করা হোক এই আমাদের দাবী। বিশেষ বিচার করা উচিত কাব্য-

গ্রন্থগুলি। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে আর্থিক ক্ষতি ছাড়া কবিদের আর কিছু প্রাপ্তি নেই – অথচ কবিতা এখনও জনপ্রিয়তার দিকে কিছুতেই মুখ ফেরায়নি, কবিতা দিন দিন হয়ে উঠেছে আরও সূক্ষ্মশিল্প, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় কবিতা রচনা এখনও অনেক বেশি কঠিন শ্রম দাবি করে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'যৌবন বাউল' গ্রন্থটিকে সম্মানিত করলে আমাদের মতে সেটাই হতো গত বৎসরের শ্রেষ্ঠ নির্বাচন।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী

এদেশে ও বিদেশে মহাসমারোহে বর্ষব্যাপী শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। রবীন্দ্রনাথের এই জগৎজোড়া সম্মান নিশ্চয়ই আমাদের গর্বের বিষয়! বহু অনুষ্ঠানে সংগীত-সাহিত্য-নৃত্যপিপাসু জনগণ টিকিট না-পেয়ে ফিরে গেছে শুনেছি। যদিও চৈত্রের শালবন শূন্যই পড়ে ছিল।

শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহু আলোচনাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিছু কিছু লেখক প্রায় সব সংকলনগ্রন্থেই উপস্থিত—তাঁরা বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। বাংলাদেশের কবিদের লেখা বিশেষ চোখে পড়লো না। অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্র রায়, অরুণকুমার সরকার প্রমুখ কবিরা কোথাও কোনো প্রবন্ধে তাঁদের ঠিক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন – চোখে পড়েনি। বিষ্ণু দে ছবি সম্পর্কে কিছু লিখেছেন —অন্যান্য কয়েকজন—কবি হিসাবে নয়, অধ্যাপক হিসাবে নানা নিবন্ধ লিখেছেন —অর্থাৎ অমুক অমুক বস্তু রবীন্দ্রনাথের রচনায় আছে কিনা অথবা কোথায় কোথায় আছে এইসব অবান্তর প্রসঙ্গ। দেশের লোক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সাম্প্রতিক কবিদের বিচার জানতে চায় না অথবা কবিদের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নেই? সাহিত্যিকদের দ্বারা একটি স্মরণ-অনুষ্ঠানের উদ্যোগও অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছে।

রবীন্দ্র মিউজিয়ম

শতবার্ষিকী উপলক্ষে দেশের অনেক লোক রবীন্দ্রনাথকে মিউজিয়মে ভর্তি করার ফন্দি এঁটেছেন। রাজনৈতিক নেতারা তৎপর হয়েছেন - তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে দ্বারপাল শ্রেণীর কুসীদজীবীরা। সম্ভবত আগামী বিধানসভায় আইন পাশ হবে - রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কোনো কথা বললেই সশ্রম কারাদণ্ড। আশ্চর্য,

মৃত্যুর এত বৎসর পরও রবীন্দ্রনাথের রচনার কোনো সুষ্ঠু বিচার হলো না—এমনই ব্যক্তি-পূজকের দেশ। অথচ প্রত্যেক যুগে যে-লেখকের রচনার নতুনভাবে বিচার হয়—সেই লেখকই বেঁচে থাকেন। নচেৎ মিউজিয়মে গ্রাম্য ভিড় হয়।

বুদ্ধদেব বসু

রবীন্দ্রনাথের রচনায় পাশ্চাত্য প্রভাব—এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু একটি ছোটো রচনা লিখেছেন—প্যারিসে এ-বিষয়ে বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসু বড়ো বেশি রবীন্দ্রভক্ত, তাঁর নানা রচনায় তার প্রমাণ, তাই রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ সত্য-ভাষণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। সমকালের অগ্রসরমান সাহিত্যচিন্তা যে রবীন্দ্রনাথ স্পর্শ করতে পারেননি, তিনি যে অস্বস্তিতে দূরে সরেছিলেন, পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলিতে যখন অকল্পনীয়ভাবে নবীন দ্বার খুলে যাচ্ছে, ঐতিহ্য, কিংবা 'দেশের মাটি' ভুলে পৃথিবীর সমস্ত প্রধান দেশের সাহিত্য যখন একস্তর থেকে দেখা শুরু হলো, রবীন্দ্রনাথ বারবার বিপ্লবীদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, ব্যক্তিগত সান্নিধ্য পেয়েছেন দিকপাল লেখকদের, তবু আমাদের দেশের সাহিত্যে এক মিড-ভিক্টোরিয়ান আবহাওয়া তৈরি করে রেখেছিলেন—এসব আলোচনা বুদ্ধদেব বসু করেননি কেন এই আমাদের অভিযোগ।

কারণ বুদ্ধদেব বসুই এখন খ্যাতিমান প্রবীণদের মধ্যে একমাত্র নির্ভরযোগ্য সচেতন লেখক—যিনি প্রথম যৌবনের নানা সঙ্কল্প থেকে কোনো প্রলোভনেই বিচ্যুত হননি এবং যিনি এখনও লেখনী ধারণ করেন সাহিত্যসৃষ্টিরই জন্য—শুধুই বাজার খরচ জোগাড় করা কিংবা বাড়িতে চলচ্চিত্র প্রযোজকদের চা-খাওয়াবার জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর দ্বিধাহীন বিচার আমরা জানতে উৎসুক ছিলাম।

নিতান্ত বিনয়বশতই বুদ্ধদেব বসু মাত্র এই মত প্রকাশ করেছেন যে রবীন্দ্র-নাথের মধ্যে এক সুপ্ত ইউরোপীয় ছিল, এদেশের আবহাওয়ায় যাকে প্রকাশ করতে তিনি সাহস পাননি, সেই অবদমিত চরিত্র প্রকাশ পায় শেষ জীবনে আঁকা ছবিগুলিতে। আশ্চর্য, এইসব কথার জন্যই বহুলোকের গাত্রদাহ হলো—গেল, গেল, রবীন্দ্রনাথের সব সুনাম গেল, বিশেষত বিদেশে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ কি কথা?—এই রব পড়ে গেল চারিদিকে, অতএব বুদ্ধদেব বসুর প্রতি অভদ্র ব্যক্তি-গত আক্রমণ শুরু হলো। যারা এই হৈ-হৈ কাণ্ডের দলভুক্ত—তারা কেউই সাহিত্যিক নন্—তাদের কথা ধর্তব্য নয়। হাটুরে দৈনিক, খেউড় মাসিক কিংবা

ব্যর্থ রাজনৈতিকের লোভী সাপ্তাহিকের নাম কোনো সাহিত্য-আলোচনায় আসে না। প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ অনেক মূর্খ সমালোচক এবং ঈর্ষাপরায়ণ পদ্যকারদের দ্বারা কুৎসিতভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। মৃত্যুর পর ঠিক সে-জাতীয় লোকেরই স্তাবকতা তিনি লাভ করেছেন। মূর্খের প্রশংসা বা নিন্দা কোনোটাই সাহিত্যিকের কাম্য নয়। সহৃদয় এবং রসজ্ঞানীর বিচারই শিল্পীর বাঞ্ছা।

হঠাৎ খবরের কাগজে সার্বজনীন কলমে বিষ্ণু দে মহাশয় এই প্রসঙ্গে এক চিঠি লিখলেন। বিষ্ণু দে আমাদের সকলের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন, আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর কবিতা থেকে বহু অনুপ্রেরণা পেয়েছেন—কিন্তু হঠাৎ তাঁর এমন শিষ্টাচার বহির্ভূত এবং নিতান্ত অশিক্ষিতের মতো মন্তব্য আমাদের বিমূঢ় করেছে। আরও কয়েকজন তরুণ কবি এবং সাহিত্যিকের ভূমিকাও দুর্বোধ্য। রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করার বদলে বুদ্ধদেব বসুকে অকারণ আঘাত করার সার্থকতা কি? বুদ্ধদেব বসুর আলোচ্য প্রবন্ধটি সমর্থন করা আমাদের অভিপ্রায় নয়। ঐ প্রবন্ধটি সুনিশ্চিত নয়, কিছুটা অসাবধানী,—শেষ দিকের মন্তব্যগুলির সঙ্গে যুক্তির জোর নেই। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি, পূর্ববর্তী কোনো কবির রচনা সম্পর্কে যে-কোনো মন্তব্য করার অধিকার তাঁর আছে। অপর লেখকেরা যুক্তি দিয়ে সেই মন্তব্যকে মিথ্যে প্রমাণ করতে পারেন কিন্তু মন্তব্য করার অধিকার খণ্ডন করা বর্বর প্রথা।

যে-কোনো লেখকই যদি সর্বজনপ্রিয় হয়ে যান, তবে সুকুমার শিল্পের দিক থেকে তাঁর পতন ঘটে। হাটে-বাজারে তাঁর গান শোনা যাবে, অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন লোক-মাত্রই তাঁর রচনার সমাদর করবে আবার সেই লেখকই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান পাবেন—এ নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথের প্রভূত রচনা---বিশেষত কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে ক্রমশ আকর্ষণহীন হয়ে আসছেন, একথা এমনই নির্মম সত্য যে হাজার জোর করলেও অস্বীকার করা যাবে না। না, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আধুনিক কবিদের আর প্রেরণা নেই, খুবই দুঃখের একথা, কিন্তু নেই। অথচ কিছুদিন আগেও তিনি ছিলেন আমাদের কাছে সম্রাটের মতো, এখনও তার যে বিরাট অংশ আমাদের অভিভূত, আপ্লুত করে তা মুখে বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী এমন-কি জীবনানন্দ দাশ যে আধুনিক কবিতার আন্দোলন শুরু করেছিলেন, বাংলা-দেশের কবিতা তার চেয়ে আরো অনেক এগিয়ে গেছে। বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতির

রচনার সঙ্গে তরুণ কবিদের রচনার দৃষ্টিভঙ্গি, শব্দ, এমনকি syntax-গত প্রভেদ প্রচুর ; শীঘ্রই তাঁদেরও হয়তো অস্বীকার করতে হবে। প্রত্যেক যুগেই কবিরা তাঁদের পূর্ববর্তী কবি-শিরোমণিকে অস্বীকার করতে চায়—নচেৎ ভারতীগোষ্ঠীর মতো আরো কিছু সাহিত্যিককে পিছন দিকে ঠেলে দেবার দল সৃষ্টি হয়।

সাহিত্য ও ঋতু

শরৎকালের আকাশ উজ্জ্বল নীল, স্বভাবতই কবিত্ব আকর্ষণ করে। বাংলাদেশের অধিকাংশ লেখকই গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত-বসন্তে মুগ্ধ হন না। শরৎকালেই তাঁদের রচনা-স্ফূর্তি হয়, সে-কারণে সারা বছর যাঁদের রচনা চোখে পড়ে না, শারদীয় সংখ্যা-গুলিতে তাঁরা গৌরবের সঙ্গে বিরাজমান। সেইসব লেখকদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

কমলবাবুর গোলাপ সুন্দরী এবং অন্তর্জলী যাত্রা পড়ে বিষম দুঃখ পেয়েছি। অন্তর্জলী যাত্রা সম্প্রতি বই হয়ে বেরিয়েছে—ধর্মগ্রন্থের মতো চেহারা। আবার পড়ে দুঃখ হলো। মনে হলো অনেক কবিতা আমার লেখা হবে না। কমলবাবু আগেই লিখে ফেলেছেন। সেগুলি যে আমি আগেই ভেবেছিলাম তা নয়। কোনোদিন মনেও পড়েনি। কমলবাবুর বই পড়ে মনে হলো, কেন আমার মনে পড়েনি, কেন এই সুকৃতির পুণ্যফল থেকে আমি বঞ্চিত হলুম। কমলকুমার মজুমদারের অন্তর্জলী যাত্রা এ-বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতার বই। এবং উপন্যাস। এবং সামাজিক নিবন্ধ। এবং যা কিছু।

'কবিতা' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে বলে বুদ্ধদেব বসুর উপর রাগ করতে পারি না। তবু তিনি অন্তত ২৬ বছর··· । শুধু মনে হয়, প্রথম লিখতে আরম্ভ করার সময় আমরা ভাবতুম যদি কখনো 'কবিতা' পত্রিকায় কখনো আমার রচনা ওঠে, তবে জীবন ধন্য হবে। স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতুম 'কবিতা' পত্রিকার দিকে চেয়ে, মলাট ওল্টাতে সাহস হতো না, যদি সূচিপত্রে আমার নাম না দেখি। এখন যারা কবিতা লিখতে শুরু করবেন—তাদের জন্য এ-স্বর্গ রইলো না। তারা কোন

কাগজে নিজের লেখা দেখে জীবন ধন্য করবেন? কোনো কাগজ নেই আর। স্বাধীনতার পর দেশের যে অনেক অনেক উন্নতি হচ্ছে তার প্রমাণ বড়ো বড়ো সেতু, হাজার হাজার স্কুল, গ্রামে ইলেকট্রিসিটি এমনকি রবীন্দ্রনাথের নামেও কোটি খানেক টাকা—এবং বাংলাদেশের কবিতা পত্রিকাগুলি একে একে উঠে যাচ্ছে।

কৃত্তিবাস প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল উনিশ শো তিপান্ন সালে। দশ বছর পূর্ণ হয়ে গেল। দীপক মজুমদার, আনন্দ বাগচী এবং আমি, তিনজনে শুরু করেছিলাম। প্রধানত উদ্যোগ ও পরিকল্পনা ছিল দীপক মজুমদারের। সে ছিল কৃত্তিবাসের গৌরবোজ্জ্বল কাল, তরুণ কবিদের স্বতন্ত্রচিহ্নের জন্য তখন কৃত্তিবাসের খুবই প্রয়োজন ছিল। প্রথম দুজন নানা কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ায় আমি কোনোক্রমে এতদিন চালালুম। দশ বছর হলো, কম সময় নয়, ভাবলেও ভয় করে।

গত সংখ্যায় শঙ্খ ঘোষ একটি কবিতায় লিখেছিলেন, 'এক দশকে সঙ্ঘ ভেঙে যায়', হয়তো তার সঙ্গে কৃত্তিবাসের বয়সের কোনো যোগ ছিল। কি জানি কেমন সঙ্ঘ গড়ে উঠলো, কি জানি ভেঙে যাবে কিনা, হয়তো ভাঙতে শুরু করেছে। কবিতা ও শিল্প যাদের কাছে যীশুর মদ ও রুটি—তারা কোনোদিন থামবে না, হয়তো সম্পাদক বা দফ্‌তরি বদল হবে, কৃত্তিবাস কোনোদিন ভাঙবে না মনে হয়। এই পত্রিকার নামকরণ করেছিলেন সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত—বাংলাদেশের কিংবদন্তির আদি কবির নামে নাম।

*

'উত্তর তরঙ্গের নায়ক' কাব্যগ্রন্থের লেখক দিলীপকুমার সেন। ঐ বইয়ের মলাটে একজন অগ্নিদগ্ধ মানুষের ছবি এঁকেছিলেন পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী। গত বছর সরস্বতী পুজোর দিন পাঁচিলের ওপর ঝুঁকে অঞ্জলি দেবার জন্য কথাবার্তা বলছিলেন দিলীপ, নিচে উনুন ছিল জলন্ত, কাপড়ের আগুন ছড়িয়ে পড়লো সারা শরীরে। অঞ্জলি দেওয়া হলো না, কিন্তু অঞ্জলির ফুল নিশ্চয়ই দিলীপ আগে থেকে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।

দিলীপকুমার সেনের মৃত্যুর পর পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও আশিষ ঘোষ একটি

পরিচ্ছন্ন শোকসভা আহ্বান করেছিলেন। সমবেত কবিবৃন্দ বললেন, দিলীপকুমার সেনের মৃত্যু এই জেনারেশনের প্রথম বিচ্ছেদ। কবিদের প্রথম আত্মীয় বিয়োগ। আমরা কৃত্তিবাসের এই সংখ্যাটি দিলীপকুমার সেনের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলুম।

*

পৃথিবীর পর পর দুটি মহাযুদ্ধ ঘটালো খ্রিস্টান ও বৌদ্ধরা—যে দুই ধর্মেরই মূল কথা অহিংসা। হিন্দু ও ইসলামে এতটা অহিংসা নেই, ন্যায়ের জন্য হিংসার কথা আছে বোধ হয়। আজ আর অন্য কোনো ধর্মবোধ নেই, মাথার উপর দণ্ডাজ্ঞার ছায়া, অন্য যে-কোনো কারণে হিংসা অসহ্য। কিন্তু ধর্মবিরোধে সায়গন ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে কাণ্ড চলেছে তার জন্য আমাদেরও দায়িত্ব আছে। যীশুর ধর্মের নামে অত্যাচার, প্রকাশ্য রাজপথে বৌদ্ধদের আত্মদান, পোপের দুর্বল প্রতিবাদ, সাম্যবাদীদের সুযোগ গ্রহণ—এগুলি যার মর্মস্পর্শ করে না, সে মর্মহীন, স্মৃতিহীন, নারকী। এর জন্য আমাদের সরব প্রতিবাদ করার প্রয়োজন ছিল; প্রকাশ্য রাস্তায় মিছিল করে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের সামনে যাবার প্রস্তাব করেছিলেন শংকর চট্টোপাধ্যায়। শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। বাংলাদেশের নবীন, প্রবীণ, দলমত-নিরপেক্ষ সমস্ত লেখকদের পক্ষ থেকে আমরা ঐ বিবেকহীন, জঘন্য কাণ্ডের প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

*

আধুনিক চিত্রশিল্পীদের মধ্য থেকে শ্রীরবীন মণ্ডলের ঈর্ষা চিত্রটি এ-সংখ্যার প্রচ্ছদে ব্যবহার করা হলো।

এলিয়ট

যখন এদেশে প্রবল আবেগে বিদেশি দ্রব্য বর্জন শুরু হয়েছিল, ঠিক সেই সময়ই বাংলা সাহিত্যে একটি বিলিতি দ্রব্য অত্যন্ত সমাদরে গ্রহণ করা হলো। টি. এস. এলিয়টের কবিতা। অতটা আপ্লুত করেছিলেন তিনি, কারণ তিনি এসেছিলেন সমীকরণ হিসাবে—নবীন আমেরিকার প্রতিভূ, ফরাসি সিম্বলিস্ট আন্দোলনের

—যা আমাদের কাছে পৌঁছুতেই স্বভাবতই দেরি হয়—ইংরেজি দর্পণ, পাউণ্ডের উন্মাদনা—এইরকম সমন্বয় হিসেবে এলিয়ট এসেছিলেন আমাদের মধ্যে। ইংরেজি কবিতায় মন্ত্রমুগ্ধ আমাদের চোখের সামনেই হত্যা করলেন শেলী-কে, সরিয়ে নিলেন সুইনবার্নের সাধের আসন, ইংরাজিভাষী জগতে প্রতিষ্ঠিত করলেন র‍্যাঁবো এবং লাফর্গ এবং করবিয়েরের উন্মাদ দেব-বালকদের স্বর। সেইসঙ্গে ভারতীয় উপনিষদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আমাদের কিছুটা মুগ্ধ করেছিল, যদিও তাঁর সে-আকর্ষণ কতটা গভীর বা সার্থক—আজ আমরা সন্দেহ করি। পাউণ্ড ঝুঁকেছিলেন চীনা দর্শন ও তত্ত্বে, এলিয়ট এসেছিলেন ভারতীয় শাস্ত্রে—দুজনেই শেষ পর্যন্ত সৌখিন ব্যবহারক।

জীবিত অবস্থায় এত খ্যাতি, সমগ্র বিশ্বে একক কবির সম্মান পেয়েছিলেন, তবু, রাজঅনুগ্রহ এবং ধর্মের কৃপায় লোভ হলো। কবি হিসেবেও এলিয়টের পতন সেই থেকে, বিগত পনেরো বছর থেকেই তিনি নিঃস্ব লেখক।

বাংলা কবিতায় তাঁর অধিষ্ঠান প্রায় কুড়ি বছর, রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্তদের প্রধান গুরু। শেষ-পর্যন্ত তাঁকে সরিয়ে দিলেন, সম্ভবত তাঁর চেয়েও একজন বড়ো কবি, জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দ বাংলা কবিতার প্রবাহ থেকে নিঃশব্দে রবীন্দ্রনাথ এবং এলিয়টের অপসারণ শুরু করে গেছেন। বাংলা কবিতা আজ সম্পূর্ণভাবে অন্তত এলিয়টের প্রভাবমুক্ত। কিন্তু কবি হিসেবে তিনি থাকবেন বহুদিন।

আকাদেমি পুরস্কার

এ-বৎসর আকাদেমি পুরস্কার বাংলায় দেওয়া হয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে। আমরা এজন্য অতীব খুশি হয়েছি। কবি হিসেবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, বাংলা কবিতায় তাঁর আগমন অবধারিতের মতো, সুতরাং ঐ পুরস্কারের উল্লেখে আমাদের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পুরস্কারের সঙ্গে আছে বিপুল অপচয়যোগ্য অর্থরাশি। ঐ অর্থে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিশ্চিত খুব প্রয়োজন ছিল।

আগামীবারের জন্য, বিচারকদের যাতে ভুল না হয়, আমরা মনে করিয়ে দিচ্ছি—যেন অবশ্য কমলকুমার মজুমদারকে দেওরা হয় ঐ পুরস্কার ও অর্থ। তাঁরও নিশ্চিত প্রয়োজন। এবং, বাংলাদেশে, সাহিত্যের জন্য ইহজীবনে এতখানি আত্মত্যাগ কমলকুমার মজুমদারের মতো কে করেছেন আর।

হাংরি জেনারেশান

অনেকেই প্রশ্ন করছেন বলে আমরা লিখিতভাবে জানাতে বাধ্য হলুম যে হাংরি জেনারেশান নামে কোনো প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের সঙ্গে কৃত্তিবাস সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত। ঐ প্রকার কোনো আন্দোলনে আমরা বিশ্বাস করি না। কৃত্তি-বাসের নামও যুক্ত করতে চাইনি কখনো। 'হাংরি' নামে অভিহিত কোনো-কোনো কবি কৃত্তিবাসে লেখেন, বা ভবিষ্যতে অনেকে লিখবেন, কিন্তু অন্যান্য কবিদের মতোই ব্যক্তিগতভাবে, কোনো দলের মুখপাত্র হিসেবে নয়। সংঘবদ্ধ সাহিত্যে আমরা আস্থাশীল নই। পরন্তু বাংলাদেশের যে-কোনো কবির প্রতিই কৃত্তিবাসের আহ্বান। হাংরি জেনারেশনের আন্দোলন ভালো কি খারাপ আমরা জানি না। ঐ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ বা পরিণাম সম্পর্কে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। এ-পর্যন্ত ওদের প্রচারিত লিফ্‌লেটগুলিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি চোখে পড়েনি। নতুনত্ব-প্রয়াসী সাধারণ রচনা। কিছু কিছু হাস্যকর বালক ব্যবহারও দেখা গেছে। এ ছাড়া, সাহিত্য-সম্পর্কহীন কয়েকটি ক্রিয়াকলাপ বিরক্তি উৎপাদন করে। পিজিন্ ইংরেজিতে সাহিত্য করার লোভ উনিশশো ষাট সালের পরও বাংলাদেশের একদল যুবক দেখাবেন—আমাদের কাছে কল্পনাতীত ছিল।

তবে ঐ আন্দোলন যদি কোনোদিন কোনো নতুন সাহিত্যরূপ দেখাতে পারে—আমরা অবশ্যই খুশি হবো।

অশ্লীল

লরেন্সের লেডি চ্যাটার্লিস্ লাভার ভারতের সুপ্রিম কোর্টে নিষিদ্ধ হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই কীর্তিটিই সম্প্রতি ভারতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কেলেঙ্কারী। আর কিছু নেই এ পোড়া দেশের, তবু ছিল ঐতিহ্যময় শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্যের গৌরব, সুস্থ পরিষ্কার বোধ ও পরমত-সহিষ্ণুতা। সেখানেও উপদ্রব শুরু হলো। এতদিন পরেও যদি লেডি সি-কে অশ্লীল বলা হয়, কার-না হাসি পাবে, যখন আরো ঢের চমৎকার চমৎকার রসালো বই খোলা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে, শিল্প বলতে শুধু ইস্পাত শিল্পই থাকবে এদেশের শাসকদের মগজে!

যাই হোক, কোনো বইকে 'অশ্লীল' বলে ঘোষণা করে কে? একজন বা

কয়েকজন ব্যক্তি। কারণ অশ্লীলতা বিষয়ে কোনো স্পষ্ট আইন বা সংজ্ঞা কোথাও নেই, হতে পারে না। সুতরাং, একজন কোনো বিচারকের যদি ক্রনিক আমাশা থাকে তবে তিনি বেশি ঘি-মশলা দিয়ে রান্না করা তরকারি বা যে-কোনো বই দেখলেই চেঁচিয়ে উঠতে পারেন, 'অশ্লীল!' 'অশ্লীল!'—আবার অপর কোনো মাংসাসবভোজী বিচারক বলতে পারেন, 'কই আর কটা আছে, আরও আনো, আরও।' অথবা, বিচারক নিঃসন্তান না বাড়িতে বহুপুত্রবতী কলত্র—তার উপরও বইয়ের ভাগ্য নির্ভর। অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষ। বড়জোর ব্যক্তিমণ্ডলী।

জ্বরের সঙ্গে যেমন মাথাধরা, মৌচাকের কাছে যেমন ভাল্লুক, তেমনি অশ্লীলতা ঘোষণার পরই বই বাজেয়াপ্ত করার উপদ্রব। অর্থাৎ কিছু সরকারী কর্মচারীই বইটি পড়তে পারবেন, আর যেন কেউ না পায়। এই অ্যাকসানটির পিছনে কী মনস্তত্ত্ব বা যুক্তি থাকতে পারে সেটাই আমাদের আলোচ্য। কেননা কোনো সাহিত্যিক ব্যাকরণ ভুল করলে আদালতে বিচার হয় না, ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার নামে কেলোর কীর্তি করলে তার শাস্তি হয় না; সবদেশেই সাহিত্যের প্রধান আসামীর নাম অশ্লীলতা। যা নাকি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। তাহলে, শুধু আদালতের ঘোষণা সারাদেশের জনসমাজে প্রচার করে দিয়ে সাধু সাবধান করলেই তো হয়। যেমন গাড়িতে-গাড়িতে প্রচার করা হয়, সাবধান, বসন্ত হচ্ছে খুব, বসন্তের টিকা নিন্। জোর করে বন্ধ করা কেন?

যে-সব দেশ সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে পেরেছে বসন্তরোগের, তারাও উচ্ছেদ করতে পারেনি সাহিত্যের তথাকথিত অশ্লীলতার, সাহিত্য এমন রক্তবীজ। ভারতবর্ষ তো কোন্ ছার। যে-কোনো একটি বইয়ের প্রচার বন্ধ করাও সাহিত্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ।

না, অপরপক্ষের বক্তব্য এই যে, সুকুমারমতি পাঠক-পাঠিকারা ঐ সব বই পড়ে বিপথে যাবেন, সুতরাং তাঁদের রক্ষা করা ধর্মাধিকরণের নৈতিক দায়িত্ব। আচ্ছা! একখানি তথাকথিত অশ্লীল পুস্তকের বিচারের সময় পুলিশ-গোমস্তা, হাকিম-উকিল, বেয়ারা-মুহুরী, সাক্ষী-জুরি সবাই বইখানি আদ্যোপান্ত পড়ে দেখেন। আজ পর্যন্ত শোনা গেছে কি, ঐ সব সংশ্লিষ্ট লোকেরা বিচারাধীন কোনো বই পড়ে বখে গেছেন, কোর্ট থেকে বেরিয়েই কেলেঙ্কারী করতে শুরু করেছেন? অর্থাৎ ইনফারেন্স এই, আদালতের ঐ অদ্ভুত কালো পোশাক পরা লোকগুলির চেয়ে আদালতের দেয়ালের বাইরের সকলেই নিম্নস্তরের প্রাণী। তাদের সকলেরই মস্তিষ্ক বিকৃত হবার অপেক্ষায় আছে মাত্র, একটু সুযোগ পেলেই।

কী ধরনের সামাজিক ক্ষতি অশ্লীল বই থেকে আশঙ্কা করা হয়। (বিঃ দ্রঃ : অশ্লীলতা মানে শুধু নারী-পুরুষের বিশেষ একধরনের শারীরিক ক্রিয়া-কলাপের মুক্ত বর্ণনা। প্রাতঃকৃত্য, কলেরারোগী, ডাক্তারি অপারেশনের বর্ণনা নয়।) হয়তো এই যে, উক্ত বই পড়ে পাঠক বা পাঠিকার মনেও যৌন বাসনা সংক্রামিত হবে। তা হোক্ না। পাঠক বা পাঠিকা যদি বিবাহিত হন, তবে, সেটা তো হবে খুবই স্বাস্থ্যকর, কত দাম্পত্য কলহ মিটে যাবে, সম্পূর্ণ আইনসম্মত। আর অবিবাহিত নারী-পুরুষদেরও যদি জাগে, জাগতেই পারে, তা মনে-মনে জাগলে ক্ষতি কী! যৌন বাসনাই তো সমস্ত মহৎ ও সামাজিক কর্মের প্রেরণা। যে-কারণে নপুংসকদের সমাজে স্থান নেই। এমন কথা নিশ্চয়ই কেউ ভাবেন না যে, ঐ রকম কোনো বর্ণনা পড়ে উত্তেজিত হয়ে কোনো তরলমতি যুবা তখুনি রাস্তায় ছুটে গিয়ে সামনে যে-মেয়েকেই দেখবে তারই হাত খপ্ করে চেপে ধরে কু-প্রস্তাব করবে। এ-রকম হাস্যকর ধারণার সমর্থন কোনো মনোবিজ্ঞানী বা সমাজবিজ্ঞানী করেছেন বলে জানি না। খুনের বর্ণনা পড়লেই লোকের মনে খুন করার ইচ্ছে জাগবে—এ কথা ভাবলে তো পৃথিবী থেকে বই ছাপার ব্যাবসাই তুলে দিতে হয়। তর্কের খাতিরে তবু ধরা যাক্, ঐ রকম কোনো গ্রন্থ থেকে সাহিত্যরস না-গ্রহণ করে, দু'-একজন নারী-পুরুষ যৌন প্রবণতাতেই আচ্ছন্ন হলো। কিন্তু কে প্রমাণ করবে যে ঐ বিকৃতির প্রেরণা বিশেষ একটি বা কয়েকটি বই? এক যদি সে কোর্টে বিবৃতি দেয়—কিন্তু, তার আগে, অপরাধ সংঘটনের আগেই বিচার ও শাস্তি, সাহিত্য ছাড়া এমন আসামী বোধহয় আদালতে দ্বিতীয় নেই। খুন করলে খুনীর বাবা কিংবা ঠাকুর্দার জেল হয় না কস্মিনকালেও, কিন্তু বই পড়ে কেউ চোর বা গুণ্ডা বা আসামী হবেন এই আশঙ্কায় বইয়ের লেখকের শাস্তি হয়।

*

উপরের লেখাটি আরম্ভ করেছিলুম সাতান্ন দিন আগে। ভেবেছিলুম, অনেক ভারি-ভারি কথা দিয়ে ইংরেজি-ফরাসি ফুটনোট সমেত এক আলোচনা ফাঁদবো। অশ্লীলতা বিষয়ে না শব্দে, বর্ণনায় না সিদ্ধান্তে—গূঢ় সম্পর্ক বা প্রত্যঙ্গের বর্ণনায় এখনও যে সংস্কৃত রূপকার্থক শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়, খাঁটি দেশজ বা হাটে-বাজারের মানুষের মুখের ভাষা যে অসম্ভব বাস্তববাদী লোকেরাও এদেশে ব্যবহার করেন না—তার কারণ কি মাথার উপরে দণ্ডাজ্ঞার ছায়া, লাইব্রেরিগুলির চরিত্র, 'আস্বাদ' শব্দটিও অর্থ না-জেনে খাদ্য সমস্যার সমাধান করা যায় কিনা, আমাদের

আইনগুলির বুকে ব্রিটিশের পায়ের ছাপ—এইসব কথাবার্তা তুলবো ভেবেছিলুম। কিন্তু এখন সাতান্ন দিন কেটে যাবার পর, খুব ক্লান্ত লাগছে। মনে হচ্ছে পুরো প্রসঙ্গটাই অবান্তর। কাটামুণ্ডের দিবাস্বপ্ন। বা কাকদন্ত গবেষণা। অর্থাৎ কাকের দাঁত নেই জেনেও তার দাঁতের রং কালো কি সাদা সেই অলীক আলোচনা। অশ্লীলতা বলে কিছু নেই—এটাই শেষ কথা। যদি থাকেও, তথাকথিত অশ্লীলতা, সেটা তো আমাদের বিষয় নয়, পৃথিবীর কোনো লেখকই আর ওসব লেখার কথা ভাবে না. আমরাও কোনোরকম অলীক লেখা চাই না, ওসব মনেই পড়ে না সত্যি কথা বলতে কি। আগেও বলেছি, আবার বলি—পাহাড়, সমুদ্র, আকাশ, শস্যক্ষেত্র, অরণ্য, নারী ও পুরুষের শরীর—আমরা সম চোখে দেখি, এদের সম্বন্ধে আমাদের সত্য অনুভূতি (বাস্তব নয়) প্রকাশের চেষ্টা করতে আমরা সকলেই বিনীতভাবে বাধ্য।

আমাদের আদালতে বিষম ভিড়, বিচারকদের এত কাজের চাপ যে এক-একটা মামলা শেষ হতে-হতে তিন-চার বছর লেগে যায়। সুতরাং সাহিত্যের মামলাও আবার ঢুকিয়ে লাভ কী? ওসব সাহিত্যিকরা নিজেরাই মিটিয়ে নিতে পারবেন। কে না জানে, লেখাপড়া না-শিখেই ছেলেমেয়েরা বখে যায়। এদেশে শতকরা নিরানব্বইটি অপরাধীই কি অক্ষরজ্ঞান-শূন্য নয়! এদেশের সব লোক আগে লেখাপড়া শিখুক, সাহিত্যগ্রন্থে হতে ছোঁয়াবার অভ্যেস হোক—তারপর বই পড়ে কেউ খারাপ হচ্ছে কি না—সে-সব সূক্ষ্ম প্রশ্ন ভেবে দেখা যাবে। সে-পর্যন্ত, পাপীদের-ছোঁয়া দূষিত হাতে পুলিশ যেন একজন লেখককেও না-ছোঁয়। যদি ছুঁতে চায়, ধর্মাবতার, আপনি ওদের ধমকে দেবেন।

সম্পাদকীয়

স্বপ্ন দেখলুম, মঞ্জুলিকার সঙ্গে দিলীপ সেনের বিয়ে হয়ে গেছে। একটা উঁচু বারান্দার রেলিঙের ওপর ওরা দুঃসাহসের সঙ্গে পা ঝুলিয়ে বসে আছে, আমরা নিচ থেকে দেখছি।

শেষের কিছুদিন মঞ্জুলিকার শরীর ভালো যাচ্ছিল না, প্রায়ই বলতো মরে

যাবো। পি. জি. হাসপাতাল থেকে মৃত্যুর দু'দিন আগে পেন্সিলে লেখা একটা চিঠি পাঠিয়েছিল আমাদের, তাতেও লিখেছিল ওর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন হবে, ও আর বাঁচবে না—ওকে যেন একবার গিয়ে দেখে আসি। আমরা যাইনি, কেননা, ইদানিং মৃত্যুভয় সকলের মুখে এবং অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন থেকে মৃত্যু বহুদূরে, তাছাড়া থানা ও হাসপাতালে সহজে ঢুকতে কে চায়? তার দু'দিন পর মঞ্জুলিকার মৃত্যু হয় রক্তের অজানিত কর্কট রোগে। দিলীপ সেনও সারা শরীরে পুড়ে হাসপাতালে অনেকদিন ছিল। তাকেও দেখতে যাওয়া হয়নি। আমাদের পরিবারে এ-পর্যন্ত এই দুটি মৃত্যু।

স্বপ্নে দেখলুম, উজ্জ্বল স্বাস্থ্যে ওরা রেলিঙয়ে বসে বসে দোল খাচ্ছে, আমাদের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ করুণা ও লঘু পরিহাসের ভঙ্গিতে হাসাহাসি দুজনের। আমি, স্বপ্নের মধ্যেই, চোখ বুজলুম কিছুটা অপ্রস্তুতভাবে।

*

আমরা একবার কৃত্তিবাসের প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো হরফে লিখেছিলাম—পৃথিবীর শেষ কিছু কবিতা অতি দ্রুত লেখা হচ্ছে। তখন সে-কথা অনেকের পছন্দ হয়নি। কিন্তু তাহলে কবিতা লেখার ও প্রকাশের এই সাম্প্রতিক হুড়োহুড়ি কী জন্য? কতগুলি কবিতা পত্রিকা এখন কলকাতায়! সুশীল রায়ের সম্পাদনায় কবিতার মাসিক পত্রিকা 'ধ্রুপদী' নিয়মিত বেরিয়ে আসছে—সেই এক আশ্চর্য ঘটনা। এরপর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় নিয়মিত বেরুচ্ছে 'কবিতা সাপ্তাহিকী'। সামসুল হক প্রকাশ করেছেন 'কবিতা পাক্ষিক'। শান্তি লাহিড়ী ও বিমল রায়চৌধুরীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় শুরু হলো 'কবিতা দৈনিক'। চুঁচড়ো থেকেও আর-একটা 'দৈনিক কবিতা'। এর পরও আবার, সুশীল রায় ও আর কয়েকজনের প্রচেষ্টায় বেরুচ্ছে 'কবিতা ঘন্টিকী'—প্রতি ঘণ্টার কবিতা-পত্রিকা। এই সবগুলিরই দাবি—এরা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম, এবং এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা আপত্তি করার কোনো কারণ দেখি না। এছাড়া আছে অসংখ্য ওষধি কবিতা-পত্র এবং একটি কবিতার টেলিগ্রাম ও 'মুহূর্ত মধুর' নামে একটি অনৈসর্গিক কিছুও যে-কোনো মুহূর্তে প্রকাশিত হতে পারে, কানাঘুসো শুনছি। এসব দেখেশুনে ভয়ে শিউরে উঠে কোনো অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু ভালো করে খুঁজে দেখলুম, এজন্য মনের মধ্যে একটা চাপা হাসিখুশিই রয়ে গেছে! যেখানে যখন যে ব্যক্তিকেই দেখি, তারই পকেট থেকে বেরোয় নতুন কবিতার পাণ্ডুলিপি, অথবা নতুন পত্রিকা। কলকাতায় কবিতা ছাড়া আর কোনো কথা নেই এখন,

কবি ছাড়া আর কোনো মানুষ নেই এবং প্রত্যেক কবিই সশস্ত্র। একটা বিপুল উত্তেজনা ও সাড়া অনুভব না-করে পারা যায় না। দেশের দুঃসময়ে কবিতা বেশি লেখা হয়। এখন দেশ জুড়ে কবিতা; সেই অনুযায়ী ১৯৬৬-র প্রথম দিকের কবিতা-পত্রিকাবলী দেখেই বাংলাদেশের ইতিহাস লিখতে হবে। অথবা, ইতিহাস লেখার হয়তো আর দরকারও হবে না।

'পৃথিবীর শেষ কিছু কবিতা অতি দ্রুত লেখা হচ্ছে'—একথা যদি সত্যি না-ও হয়, তবে শেষ পৃথিবীর কিছু কবিতা এখন দ্রুত লেখা হচ্ছে—এ-কথাই হয়তো সত্যি।

*

মাঝে-মাঝে কোনো বৃহতের সামনে না-দাঁড়ালে মন ক্ষুদ্র হয়েই থাকে। কলকাতায় কোনো বৃহৎ দৃশ্য নেই—মানুষ বা মূর্তি বা সৌধ। পৃথিবীতে সমুদ্রই এখন একমাত্র চাক্ষুষ বৃহৎ। বিখ্যাত বন্দর কলকাতা, অথচ এখান থেকে সমুদ্রে যাওয়া যায় না। বঙ্গোপসাগর থেকে হাওয়া আজকাল আর এ-শহর পর্যন্ত আসে না। কিছুটা স্তব্ধতা ভিক্ষা করার জন্য সোমেন পালিতকে যেতে হয়েছিল জুহুর সমুদ্র পারে। গত অর্ধ দশক ধরে শুনছি, নামখানায় একটু সেতু তৈরি হলেই ফ্রেজারগঞ্জ যাওয়া যাবে অতি সংক্ষিপ্ত কালে। তবু, এতদিন ধরে কেন সেই সেতু তৈরি হচ্ছে না? বুঝতে পারি না, কলকাতা থেকে যে-কোনো দিন সকালে বাসের টিকিট কিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সোজা সমুদ্র পাড়ে পৌঁছুবার অধিকার আমার কেন থাকবে না? শুধু বৃহতের সামনে দাঁড়ানো বা সৌন্দর্য দর্শনই নয়, আত্মহত্যার জন্যও সমুদ্র অতি প্রশস্ত। সে-পথ খুলে দেওয়া হোক।

কৃত্তিবাসের আগের সংকলনটি বেরিয়েছিল পাঁচ মাস আগে। ইতিমধ্যে এক অভূতপূর্ব কবিপক্ষ আমরা যাপন করেছি, যখন সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে গিয়ে শুধু কবিতার কাগজই বেরোচ্ছিল প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে। ফল: ঘুণধরা বাংলা-দেশে কবিদের পপুলেশন এক্স্‌প্লোশন—শতকরা তিনশো; কবিতার নিষ্ফলবৃদ্ধি শতকরা পঞ্চাশ, এবং কবিতার পাঠক শতকরা পাঁচ। চরম দুর্দিনে বাংলাদেশের

অধিকাংশ লোক আজ প্রবহমাণ পয়ারে কথা বলছেন; এতকাল কবিতার বিষয় হিসাবে চিহ্নিত মহিলারা পর্যন্ত,—যে-কারণে অন্যান্যবারের তুলনায় এবার কৃত্তিবাসে অনেক মহিলা-কবির সাক্ষাৎ পাবেন পাঠক। সম্পাদকীয় বিভ্রান্তির জন্যে, এমনকি একজন কবির নামে মুদ্রণপ্রমাদ ঘটে গেছে। শ্রীমতী লতিকা কুণ্ডু ক্ষমা করবেন। *** এই সংকলনের প্রধান কবি সুধেন্দু মল্লিক। হৃদয়-সংকট বা অন্য কিছু তাঁকে আজকাল প্রচণ্ড উত্তেজিত করে রেখেছে দেখছি, মুখচোরা ভদ্রলোকটি অকস্মাৎ অসংখ্য ভালো কবিতা লিখছেন। যে ক'টি আমরা কেড়ে আনতে পেরেছি, নিবেদন করলাম। *** মাত্র বাইশ বছর বয়সে কবি অনাময় দত্ত-র মৃত্যু হয়েছে দু'মাস আগে। গত সংকলনে ওর কবিতা ছিল, এবার কৃত্তিবাসে লেখা দেবার সময় পায়নি। দাম্ভিক এই তরুণ যুবক দুঃখের স্বরূপ খুঁজছিল, তার ওপর প্রগাঢ় আঘাত হানবে বলে প্রস্তুত হচ্ছিল হয়তো—আমরা দূর থেকে লক্ষ্য করছিলাম, এমন সময় কার হাতছানি ওকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল উচ্চতর শাখায়, ফলের মতন। ওর শেষ কয়েকটি কবিতা সংগ্রহ করতে পেরেছি, পরিমার্জনার চেষ্টা না-করে প্রকাশ করলাম। কাঁচা হাতের ত্রুটিসমেত কবিতাগুলি ওর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেবে। *** নানাকাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে কৃত্তিবাসের স্থায়ী সম্পাদক এই সংকলনটি সম্পাদনার ভার দিয়েছিলেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের ওপর, এর দোষ-ত্রুটির জন্যে যেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে অকারণ বিরক্ত করা না-হয়, এই অনুরোধ।

—